শ্রদ্ধেয় রাজধানী

হানিফ সংকেত

রম্যরচনার কাজটি একটি দুরূহ কাজ। উপাদান গুরু অথচ তা দিয়ে লঘু পাক করতে হবে। অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। বিশ্বের সবচাইতে কঠিন কাজ হলো দর্পনের সাহায্য ছাড়া পরিপার্শ্বের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়া। হানিফ সংকেত সেই দুর্লভ শক্তির অধিকারী। তার প্রতিটি লেখাতেই রয়েছে এক ধরনের আনন্দ-আর একরকম মজা। বাংলাদেশ টেলিভিশনে দীর্ঘ এগারো বছর ধরে তার পরিচালনা ও উপস্থাপনায় 'ইত্যাদি' নামে একটি বিনোদনমূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। নিকট অতীতে আর কোন অনুষ্ঠান এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। এর কারণ অনুষ্ঠানটিতে রয়েছে সমাজ ও সময়ের নানান জীবন্ত ছবি। চলমান জীবনের অসংগতিগুলোর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ। রয়েছে রঙ্গ ও ব্যাঙ্গের কষাঘাত। বিদ্রূপ বা কটাক্ষ থাকলেও তার অনুষ্ঠানে আদ্যন্ত আকর্ষণ তার রসালো উপস্থাপনা্যাদি।

যেমন দর্শকপ্রিয় হয়েছে তেমনি সর্বজনভোগ্য, বুদ্ধিদীপ্ত, ঝকঝকে এই সরস গ্রন্থ শ্রদ্ধেয় রাজধানী পাঠক প্রিয় হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রদ্ধেয় রাজধানী

হানিফ সংকেত

নিউ শিখা প্রকাশনী

প্রকাশকাল
ফেব্রু: বইমেলা ১৯৯৫
স্বত্ব
পাণ্ডুলিপি হানিফ/ফাগুন
প্রকাশক
কাজী মোঃ শাহজাহান
লিখা প্রকাশনী
৬৫ প্যারিদাস রোড ঢাকা ১১০০
ফোন ২৩৫২৫৯
পরিবেশক
নিউ লিখা প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা
লেজার
কে এম
অলংকরণ
ইকবাল হোসেন সানু
মুদ্রণ
পালমাদী মুদ্রণ
নয়াবাজার ঢাকা
দাম
পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

উৎসর্গ

শাহাদত চৌধুরী শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচী

টেনশন /৭
ভাক বিভ্রাট/১০
এক মিনিট /১৩
আপনি কি সত্যি বলছেন / ১৭
বিকশিত দন্ত /২১
ঘুষের দৌরাত্ম্য /২৪
হায়রে উন্নতি /২৭
অন্ধজনে আলো দাও /৩১
শ্রদ্ধেয় রাজধানী /৩৪
প্রায়ের প্রতিভা /৪৯
বিশ্বকাপ ফুটবল এবং আমরা /৫৩
বিশ্বকাপের প্রভাব /৫৭
নিখোঁজ লাগেজ /৬১
চুলকানি /৬৪
পলিটিক্যাল মাস /৬৭
সাহেবের বাচ্চা /৭০

টেনশন

কী ভাই এত পেরেশান কেন?

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব চাইলে সরাসরি যে উত্তরটি পাওয়া যায় তা হল 'টেনশন।'

টেনশন এবং ফ্রাস্টেশান শব্দ দুটি ইদানীং ভর করেছে অনেকের ওপর।

কাজে 'এ্যাটেনশান' নেই।

কারণ টেনশন নইলে ফ্রাস্টেশান। সবসময়ই একটা টেনশনের মধ্যে আছে সবাই।

বলতে গেলে টেনশন। চলতে গেলেও টেনশন।

বাকস্বাধীনতা আছে, গণতন্ত্র আছে যার যা ইচ্ছা বলতে পারেন, করতে পারেন। তারপরও টেনশন। কী বলতে কী বলে ফেলি। কোনটা বললে কী অর্থ দাঁড়ায়। কারণ বিবৃতির বাজার চড়া। কাগজ খুললেই চোখে পড়ে বক্তব্য, বিবৃতি শুরু হয় বিশ্লেষণ। একই কথার দশজনে দশ রকম অর্থ বের করেন। যিনি যে উদ্দেশ্যে যে কথা বলেন—তিনি নিজেও আশ্চর্য হয়ে যান—'এমন কথা কখন বলেছি!' হয়ত নিজের অজান্তে কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে বলেছেন। বাস আর রক্ষে নেই। প্রথমে পাল্টা বিবৃতি, তারপর জেল, জরিমানা, ফাঁসি, হরতাল। পুরো জাতির শান্তি গায়েব। সুতরাং যা বলবেন চিন্তা করে বলবেন। আপনার একটু অসতর্ক কথায় নিজের ঘরের শান্তি যেমন বিনষ্ট হতে পারে তেমনি জাতীয় সমস্যা মোকাবিলায় অগ্রণী ব্যক্তিদের (!) অসতর্ক কথায় পুরো জাতির বারটা বাজতে পারে। কারণ বলতে দিলে আমরা থামি না। কী বলা উচিত ভাবি না। তালি পাওয়ার প্রেরণায় নিজে যেটা বিশ্বাস করি না সেটাও বলি। সুতরাং এই উল্টোপাল্টা বলাবলির কারণে অহেতুক দলাদলির সৃষ্টি হয়। নিজের শান্তির জন্য অন্যের বলার উপরও আমাদের নির্ভর করতে হয়। অথচ মুখটি আমার নয় আপনার। সুতরাং বলা নিয়ে টেনশন রয়েছেই। অথচ যেসব বিখ্যাত (!) ব্যক্তিত্বদের 'বলার' উপর

'কথার' উপর আমাদের টেনশন হয় তারা কিন্তু 'টেনশন লেস্'।

এবারে 'চলায়' আসুন। কোথায় চলবেন? রাস্তায়?—যানবাহনের টেনশন। অফিসে যাবেন? বাসা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেন। টেনশন-যানবাহন পাব কি পাব না। পেলেও ভাড়ায় পোষাবে কি না। ধরুন পোষাল। এবারে নতুন টেনশন, পকেটটা জায়গামত আছে কি নেই, নাকি কাটা হয়ে গেছে। পকেটটা একহাতে ধরে পকেট কাটার টেনশনমুক্ত হলেন। এবারে ঐ যানবাহনে উঠে জান যাওয়ার টেনশনে পড়লেন। কারণ অতি-গতি। ধরা যাক দুর্ঘটনাবিহীন অবস্থায় অফিসের কাছাকাছি এসে গেছেন। দুঃখের মধ্যেও চিত্তে আনন্দ উঁকি দিয়েছে, যাই হোক সময়মত অফিসটা ধরা যাবে। না—গাড়ির গতি কমে গেল, কারণ জ্যাম। পড়লেন জ্যামের টেনশনে। টেনশন দ্রুত এখান থেকে বিস্তার লাভ করল—অফিসে যেতে দেরি হবে। বসের ধমক। ইনক্রিমেন্ট বন্ধের হুমকি। কোন ফাঁকে যে পকেটে রাখা হাত দিয়ে কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছতে শুরু করেছেন নিজেও জানেন না। ঘাম মুছে হাতটা যখন জায়গা মত নিয়েছেন—দেখলেন পকেট আছে। পকেটের জিনিসগুলো নেই। আবার কপালে ঘাম জমল।

কিন্তু জ্যামের কারণে সকালের উজাড় করা রোদে চরম অস্বস্তি এবং কাটা যাওয়া শূন্য পকেটের চিন্তা নতুন টেনশনের জন্ম দিল। মনের আয়নায় সন্তান এবং স্ত্রীর মুখখানি ভেসে উঠল। সারামাস সন্তানদের কী খাওয়াবেন? ভাবছেন। গাড়ীর হর্ণে সম্বিৎ ফিরে পেলেন। জ্যাম ছুটেছে। অফিসের সামনে এসে গাড়ি থেকে নামলেন। সোজা বসের কক্ষে গিয়ে ঢুকলেন। ধমক খেলেন। খারাপ লাগল না কারণ মনে এখন অন্য টেনশন কাজ করছে। যা কিছু নিয়ে মন চিন্তা করতে বাধ্য নয়—কিছুতেই ছাড় পায় না তাকে নাকি দুঃশ্চিন্তা বলে। মনে এখন দুঃশ্চিন্তা ভর করেছে। অশথগাছের শিকড়ের মত যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। বেরোবার পথ নেই। নিজের চেয়ারে এসে বসলেন। ফাইল দেখায় উৎসাহ নেই। কারণ সততা। অসৎ হলে এই ফাইল আশার আলো দেখাতো। কারণ বাসে আপনার পকেট কাটা গেছে অফিসে তাই ফাইল দেখিয়ে আপনিও অন্যের পকেট কাটতে পারতেন। লাভ কী হতো? আপনার দুঃখ, আপনার টেনশন অন্যের কাঁধে ভর করতো। সুতরাং টেনশন থেকে মুক্তি নেই। অফিস থেকে বেরুলেন। পকেট ফাঁকা। বাড়ি যাবেন কী করে? আর এক টেনশন। কেউ উপকার করবে না। সহকর্মীদের কাছে ধার চাইলে অলক্ষ্যে টিপ্পনি কাটবে। এখানে বিপদে কেউ এগিয়ে আসে না। এ্যাক্সিডেন্ট হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকলে উৎসাহী জনতার ভিড় পাবেন। কিন্তু হাসপাতাল পর্যন্ত নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে নিয়ে যাবার লোক পাবেন না। বৃদ্ধকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে আসবে না। বরং তাকে পিছনে ফেলে কে আগে

যেতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলবে। এটাই নিয়ম।

ভালো বংশের লোক আপনি। জান দেবেন—মান দেবেন না। সুতরাং হেঁটে যাবেন গুলিস্তান থেকে মিরপুর। ভাবতে গিয়েও টেনশন। যেতে যেতে রাত হবে। পথে ছিনতাইকারী কিংবা জঙ্গী মিছিলের সামনে না পড়লেই হয়। এদিকে বাড়িতে টেনশন। স্ত্রী জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। ব্যাপার কী ফিরছে না কেন! "মাথায় কতো প্রশ্ন আসে দিচ্ছে না কেউ জবাব তার।" স্ত্রী ভাবছেন—ওর তো কোনো খারাপ অভ্যাস নেই, তাহলে এতো দেরি করছে কেন? শুরুতেই 'নেগেটিভ ভাবনা'। স্ত্রীর দোষ দিয়ে লাভ নেই। এভাবেই আমরা "ভাবনা শিক্ষা" লাভ করেছি। বাড়িতে একসময় পৌঁছুলেন। তখন রাতের খাবারের সময় হয়েছে। বাড়িতে ঢুকেই শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিলেন। পা দুটো ব্যথায় টনটন করছে। সব শুনে ব্যথিত স্ত্রী পায়ের ব্যাথা উপশমের চেষ্টায় গরম ছ্যাঁকা দিলেন পায়ে। ব্যথা কমল না।

ঘুমাতে চেষ্টা করছেন। ঘুম হলে ব্যথা বোধ থাকবে না। মাথায় ভাবনা থাকবে না। আজ মাসের ৩ তারিখ। গতকাল বেতন পেয়েছেন। মাসের শুরুতেই এই দুর্ঘটনায় পুরো মাসের টেনশনে রাতে ঘুম এল না। শেষ রাতে একটু ঘুমালেন, সকালে পা' দুটো আর তুলতে পারছেন না। শরীরটাও গরম। থার্মোমিটারে ১০২ ডিগ্রি জ্বর ধরা পড়ল। একদিন, দুদিন, তিনদিন জ্বর ভালো হওয়ার লক্ষণ নেই। সারাজীবন সততা নিয়ে চলেছেন তাই ব্যাংক ব্যালেন্স নেই। অন্তিম সময়ে ডাক্তার, ওষুধ ও পথ্য সঙ্কটে পড়লেন। সুযোগ পেয়ে রোগও আপনাকে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় নিয়ে গেল। এভাবে দেখা গেল একদিন আপনার সব টেনশন শেষ হয়ে গেছে। আপনি মুক্ত। আপনাকে আর কোনো নেতার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে শুনতে হবে না, "আপনাদের সুখের জন্যই আমাদের রাজনীতি।"

আপনার সুখের জন্য কারো কাছে ঋণী হতে হল না। কারণ আপনি তখন এই লোকালয় ছেড়ে লোকান্তরে। পরপারে। শুধু আপনার সন্তানেরা এপারে থেকে আপনার টেনশনগুলো নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। এর নাম জীবন।

ডাক বিভ্রাট

না, এ ডাক সে ডাক নয়—ডাকাডাকি অর্থাৎ সম্বোধন। আমাদের বিভিন্ন নাম রাখা হয় ডাকার জন্য। তথাপিও আমরা সবাই কিন্তু সবার নাম ধরে ডাকতে পারি না। যেমন ধরুন আমাদের বিভিন্ন নাম রয়েছে করিম, রহিম, হাসেম, কাসেম ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব নামে ডাকলে সংশ্লিষ্টরা জবাব দেয়। সন্তানরা মা-বাবাকে মা, আব্বা, ড্যাডি, পাপা, আব্বু, আব্বা, ড্যাড যার যা ইচ্ছে হয় ডাকে। এ-ছাড়াও বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনকে ডাকার জন্য চাচা, মামা, খালা, খালু, দাদা, দাদি, নানা, নানি, জেঠা, তালই ইত্যাদি বিভিন্ন নাম বা শব্দ রয়েছে। অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারিদের কাজ অনুযায়ী চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন পদ রয়েছে। আবার মানুষের চরিত্র বোঝানোর জন্যও কিছু শব্দ রয়েছে যে শব্দগুলো শুনলেই বোঝা যায় লোকটির চরিত্র কেমন। যেমন—সৎ, বদ, ঈর্ষুক, হিংসুক, ভাল, মন্দ চরিত্রবান, চরিত্রহীন ইত্যাদি। এমনিভাবে মানুষকে চেনাবার জন্য, পরিচয় তুলে ধরার জন্য, সম্পর্কের জন্য, সর্বোপরি ডাকাডাকির জন্য এ-ধরনের বিভিন্ন শব্দ রয়েছে। যার ফলে ডাক বিভ্রাটের একটা সুরাহা হয়েছে। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে যাদের ডাকার জন্য (একে অপরকে) মামা-চাচার মতো কোনো নির্দিষ্ট শব্দ নেই। আর তা হচ্ছে স্বামী স্ত্রী। স্বামী স্ত্রীকে নাম ধরে ছাড়া কী করে ডাকবে? কিংবা স্ত্রী? এ ব্যাপারে কোনোকিছুই স্থির করা হয় নি। এত পণ্ডিত রয়েছেন চারদিকে কিন্তু এই সমস্যাটি চিন্তা করেন নি কেউ। অথচ এটা একটা সার্বজনীন সমস্যা। কারণ স্বামী যদিও বা স্ত্রীর নাম ধরে ডাকেন কিন্তু স্ত্রীর স্বামীর নাম ধরে ডাকা ঠিক নয়। এটি একটি সংস্কার, তা সু-সংস্কারই হোক বা কু সংস্কারই হোক। যার ফলে গ্রামের অনেক কুলবধূ এই ডাক বিভ্রাটে পড়ে ভীষণ ঝামেলায় পড়ে যান। কারণ তারা পুরানো সেই প্রবাদটি বিশ্বাস করে,

"বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।"

জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।

এই ডাকাডাকির কোনো সুরাহা না থাকায় সন্তানের নামে উভয়ে উভয়কে ডাকেন। যেমন সন্তানের নাম যদি 'গেদা' হয়। স্বামী ডাকেন, 'গেদার মা এদিকে আস'। স্ত্রী ডাকেন, 'গেদার বাপ একটু শোনেন'। যার ফলে সে আমলে বাচ্চাকাচ্চা হলে এটাও একটা বাড়তি আনন্দের কারণ হত। বাচ্চার জন্যে—এই ডাক বিভ্রাটের অন্তত কিছুটা অবসান ঘটে। সে আমলের কথা বলতে গিয়ে প্রিন্সিপাল শাহাদাৎ হোসেন খান আমাকে একটি মজার ঘটনা শোনালেন, একবার গ্রামের এক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনমালিন্য হয়েছে, কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। এদিকে পলো নিয়ে লোক ছুটেছে নদীতে মাছ ধরতে। সতিলক্ষ্মী স্ত্রী জাংলায় কচি লাউয়ের দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মনে মনে বলছে, "আহা দুটি মাছ হলে লাউটি বেশ মজত।" ভাবতে ভাবতে রসনা ভিজে আসে। কিন্তু উপায় কী? স্বামী তো আর মাছ ধরতে যাচ্ছে না। তাই স্ত্রী শেষে মৌনতা ভঙ্গ করে পরোক্ষভাবে বলে উঠে, আর তার জবাবে স্বামীও পরোক্ষে উত্তর দিতে থাকে—

স্ত্রী—পলো বাইবার যায় যে মানুষ
মানুষ যায় না কেন।
স্বামী—সাত দিনের না খাওয়া
পলো বাইব কেন?
স্ত্রী—ছিকার উপর ভাত বাড়া
পাইড়া খায় না কেন।
স্বামী—খাটোখুটো মানুষটি
নাগাল পাইব কেন?
স্ত্রী—পিঁড়ির ওপর পিঁড়ি দিয়া
পাইরা খায় না কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবার আর একটি ঘটনা—একবার খেয়া পার হবেন এক নারী। কিন্তু তার কাছে পয়সা নেই। তাই মাঝি তার স্বামীর পরিচয় জানতে চাইলে স্ত্রী-লোকটি বললেন,

তিন তের আরো বার
নয় দিয়া পুরা কর।
আমার স্বামীর এই নাম
পার কইরা দেও—নাইওর যাম।

অর্থাৎ ১৩ + ১৩ + ১৩ + ১২ + ৯ = ৬০। এই ষাট বলার কারণ হচ্ছে স্ত্রীলোকটির স্বামীর নাম ষাটু মিঞা।

সে আমলে এই ডাক বিভ্রাটের কারণে এমন অনেক মজার মজার ঘটনা রয়েছে। এতে বোঝা যায় স্বামীর নাম মুখে আনতে না পেরে অসহায় স্ত্রীকে কতরকম পন্থাই

না অবলম্বন করতে হয়েছে। তখন এমন অবস্থাও হত অনেক নারী স্বামীর নামের কাছাকাছি কোনো শব্দও উচ্চারণ করতেন না। যেমন একজনের স্বামীর নাম ছিল আব্বাস। সে গাবগাছ বলতো না, একজনের নাম ছিল কালু মিঞা, সে জীবনেও কাউকে কালো দেখলে কালো বলত না। আর একজন নারী ছিলেন যিনি দুধকে জীবনে দুধ বলতেন না। বলতেন, 'ধলা পানি' কারণ তার স্বামীর নাম ছিল দুদু মাতব্বর। এই প্রসঙ্গে একটি পুরোনো গল্প রয়েছে, এক মহিলার স্বামীর নাম ছিল আলু আর ভাশুরের নাম পটল। সে সময় মহিলারা স্বামীর বা ভাশুরের নাম মুখে আনতেন না। একদিন সেই মহিলা আলু আর পটল দিয়ে নিরামিষ রান্না করেছেন। এমন সময়ে পাশের বাড়ি থেকে আর এক মহিলা এসে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপা আজকে কী রেঁধেছেন?"

মহিলা চুপ। কারণ স্বামী আলু আর ভাশুর পটল—এদের নাম কী করে মুখে আনবেন? অনেকক্ষণ চিন্তা করে মহিলা জবাব দিলেন, "আইজ তারে দিয়া অরে জাবরা রানছি।"

এ তো গেল সে আমলের কথা যখন টিপু সুলতান ও তার স্ত্রীকে জনাবা বেগম সাহেবা বলে আপনি আপনি সম্বোধন করতেন। আর এখনকার বাজারে এই ডাকের জন্য কোন শব্দ না থাকায় যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয় তা হচ্ছে হ্যাগা, হ্যাগো, ওগো, এই, শুনছো, ওলো, মনা, সোনা, যাদু, কইতর, কলিজা, জান, ময়না, টিয়া ইত্যাদি অর্থাৎ যার যা সুবিধা। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে 'আমার সাহেব'— 'উনি' ইত্যাদিও বলে থাকেন। এটা মধ্যবিত্ত ডাক। আর উচ্চবিত্তে হার্ট, ডার্লিং, হায়, ণুই, হেই (না কুংফু নয়), সোল (জুতার সোল নয়-আত্মা) ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ডাকেন। আগে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হলেও 'আপনি' সম্বোধনটা থাকত। আর এখন ঝগড়া হলে আপনি তো দূরের কথা—তুমি হয়ে যায় তুই—তুই থেকে স্বামী বেচারা বিভিন্ন পশুর বাচ্চা হয়ে যায়। এর পরে মারামারি, চুল ধরাধরি, এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক পর্যন্ত গড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে এসিড মারা, গরম ছ্যাঁকা দেয়া এমন কি জীবন নেয়া পর্যন্ত গড়ায়। কিচ্ছু করার নেই। তখন আমরা 'সেকেলে' ছিলাম তাই আমাদের মধ্যে আদব-কায়দা, ভদ্রতা, পারস্পরিক সম্মানবোধ ছিল। আর এখন সবাই 'একেলে' হয়েছেন। তাই ওসবের মৃত্যু ঘটেছে। সভ্যতার অগ্রগতি হচ্ছে! আমাদের উন্নতি হচ্ছে। আমরা এই সভ্য জগতের বাসিন্দা। কিন্তু আসলে আমরা কি? সভ্য-নাকি অসভ্য?

এক মিনিট

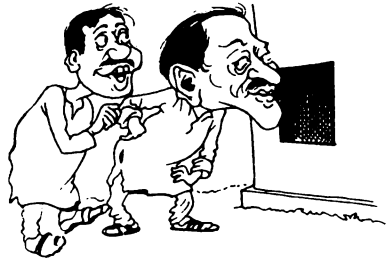

এক মিনিট !
এক মিনিট ! !
এক মিনিট ! ! !

এভাবে পর পর সাজিয়ে লেখার কারণ হচ্ছে এই শব্দ দুটি ইদানিং ডিশের কল্যাণে, জিটিভির আগ্রাসনে সকলের মনে গানে গানে ঢুকে আছে। লেখা বলে সুর করে বলা গেল না তবে আমার প্রসঙ্গ জিটিভির ঐ 'এক মিনিট' নয়। জিটিভির ঐ অনুষ্ঠানটির ধরন হল এক মিনিটে কে কত তাড়াতাড়ি তাদের জন্য নির্ধারিত কাজগুলো করতে পারে এবং এই সময়সীমার মধ্যে করতে পারলে পুরস্কৃতও করা হয়। আনন্দ ও বিনোদন দেয়াই হচ্ছে ঐ অনুষ্ঠানটির লক্ষ্য। উপস্থাপক ও প্রতিযোগীদের অংগভংগি সেটাই প্রমাণ করে। তবে আমার এই এক মিনিট বিনোদনের লক্ষ্যে নয়। শুধুমাত্র এক মিনিটের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য কিছু লেখার চেষ্টা। আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বোপরি জাতীয় জীবনে এক মিনিটের গুরুত্ব অপরিসীম। বলতে গেলে আমরা সময়ের সমুদ্রে আছি দিন, ঘন্টা, মাস, বছর মিলিয়ে প্রচুর সময় কিন্তু তবুও আমাদের আক্ষেপ—'এক মিনিটও সময় পাই না।' এ যেন, আকাল কেঁড়ের খাঁই। অর্থাৎ যে খাঁই সহজে মেটে না। সময়ের দাবি আছে সময়ের ব্যবহার নেই। অথচ সময় কিন্তু বৃত্তের মত আমাদের চারদিকে ঘোরে। বছর, মাস, সপ্তাহ, দিন, ঘন্টা নয়—একটি মিনিটের কথা চিন্তা করুন। এক মিনিটে কী না হয়। টেলিভিশন বিজ্ঞাপনে দেখেছেন বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার হিসেব দিতে গিয়ে প্রতিদিনই বলছে প্রতি মিনিটে লোকসংখ্যা বাড়ছে চারজন। তেমনি আমাদের সমাজে যে খারাপ বা অশুভ কাজগুলো রয়েছে তা কিন্তু মিনিটের মধ্যেই হয়। যেমন ধরুন রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। সেখানে মিনিটও লাগে না। মুহূর্তের মধ্যে ছিনতাই হয়ে যাচ্ছে, তেমনি মুহূর্তের মধ্যে চাপা দিয়ে চলে যাচ্ছে ঘাতক ট্রাক-বাস। ১২ মে '৯৪ নটরডেম কলেজের মেধাবী ছাত্র মোস্তফা কামাল (১৮)

ঘাতক ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হয়। মেধাবী ছাত্র কামাল ৬টি লেটারসহ এস এস সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল। অথচ মুহূর্তের মধ্যে ঘাতক ট্রাক তার মাথাটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলে। পুলিশ ট্রাকটিকে আটক, করেছে। কিন্তু চালক মুহূর্তের মধ্যে সবার চোখের সামনে দিয়েই পালিয়ে গেছে। আর এসব কারণেই প্রায় সব দুর্ঘটনার পরে কাগজে দেখা যায়, 'গাড়িটি আটক চালক পলাতক।' এবারে রাজনৈতিক অঙ্গনে আসুন, মিছিল হচ্ছে, হঠাৎ উত্তেজনা। (যে উত্তেজনার কারণ আমি এখন পর্যন্ত বুঝতে পারি না। মূর্খ নাকি?) আর যায় কোথায়? ভাঙ্গ গাড়ি? যত দোষ নন্দ ঘোষ। (আমাদের দেশের গাড়িগুলো আর কতদিন এই 'নন্দ ঘোষ' হয়ে থাকবে কে জানে?) দেখা গেল মিনিটের মধ্যে জঙ্গী আক্রমণে ১০/১৫টি গাড়ির কাচ নেই। অবস্থাদৃষ্টে যে কোনো আগন্তুক হয়ত বলে বসবেন—বাবা এ তো 'আচাভুয়ার বোম্বাচাক।'

অসম্ভব ব্যাপার।

না "ইহাই সম্ভব, ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই সরল, ইহাই নির্মল। ইহা চলিয়া আসিয়াছে, ইহা চলিতেছে এবং ইহা চলিবে। ইহার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে তাহারা তাহার গাড়ীর কাচ ভাঙ্গিবে নইলে মাথা ভাঙ্গিবে" এবার কোন অফিসে আসুন। সহকর্মীরা আলোচনায় মশগুল, যে আলোচনার অধিকাংশই 'গুল'। এমন সময় হয়ত তাদের অপছন্দের কারো সম্পর্কে একটু প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করলেন। বাস যাবেন কোথায়? মৌচাকে ঢিল। মিনিটের মধ্যে ঐ লোকটিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খারাপ লোক হিসেবে প্রমাণ করে দেবে। যে প্রমাণে যুক্তি খোঁজা বৃথা। মনীষী ফিলিপ মাসটীনের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। সময়কে উপভোগ করার জন্য তিনি বলেছেন, 'জীবনে কিছু সময় হাসার জন্য, কিছু সময় ভালো করার জন্য এবং কিছু সময় প্রিয়জনকে ভালবাসার জন্য।' আর আমাদের এখানে ব্যাপারটি দাঁড়িয়েছে এরকম, জীবনে কিছু সময় ভাঙার জন্য, কিছু সময় মারার জন্য, কিছু সময় পরচর্চার জন্য', সুতরাং বোঝা যাচ্ছে সবচেয়ে বড় অপচয় আমরা যা করে থাকি তা হচ্ছে সময়।

এবার এই 'সময়' অপচয়ের কয়েকটি নমুনা দেয়া যাক। এক মিনিটের কথাই ধরুন। আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে আমরা এই এক মিনিটকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকি। যার সঙ্গে কাজের কোনো মিল নেই। যেমন অফিসে কর্মকর্তার সামনে কেউ ফাইলের খোঁজ নিতে আসলে অনেকেই প্রথমে যে কথাটি বলেন, তা হচ্ছে, 'এক মিনিট' ।

যে এক মিনিট শেষ হতে ঘণ্টা, দিন, মাসও লেগে যেতে পারে এবং ঐ ব্যক্তিকে প্রতিদিনই কর্মব্যস্ত(!) কর্মকর্তার এক মিনিট শব্দ দুটি শুনেই যেতে হয়।

টেলিফোন করেছেন কোন অফিসে—হ্যালো করিম সাহেব আছেন?

'এক মিনিট'

অপর প্রান্ত থেকে বললেন কেউ একজন।

নির্দিষ্ট সময়ে আর এক মিনিট শেষ হল না। বাধ্য হয়ে রিসিভার রেখে দিলেন। কোন কঠিন কাজ অনেকে মিলে করতে চেষ্টা করেও সফল হচ্ছে না। হঠাৎ অতি উৎসাহী একজন বলে বসলেন,

"দাঁড়াও এক মিনিটের মধ্যেই করে দিচ্ছি"

কোথাও দাওয়াত খেতে যাবেন সস্ত্রীক। রেডি হয়ে পায়চারি করছেন কখন স্ত্রীর মেকাপ শেষ হবে। বিরক্ত হয়ে তাগাদা দিলেন, কই হল?

"এক মিনিট" স্ত্রীর জবাব।

স্ত্রীর ঐ এক মিনিট (!) শেষ হওয়ার পর যখন বেড়াতে গেলেন, দেখা গেল অতিথিরা সবাই প্রস্থান করছে আর আপনারা ঢুকছেন। দ্রুত উন্নয়নশীল পৃথিবী সবদিক থেকেই এগুচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা সবকিছুতেই গতি এসেছে। শুধু গতি আসে নি মহিলাদের সাজসজ্জায়। উন্নয়নের কারণে নতুন নতুন প্রসাধনী সামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে। আর এইসব নতুন নতুন সামগ্রী ব্যবহারে কিছু কিছু স্ত্রী সময়কে হত্যা করছে নিষ্ঠুরভাবে।

কোথাও বিল জমা দিতে গেছেন কিংবা বিল আনতে গেছেন। দুটোই লাইনের ব্যাপার। অর্থাৎ লাইন ধরে দাঁড়িয়ে বিল দিতে হবে কিংবা নিতে হবে। যিনি কাঁচঘেরা কক্ষে বসে আছেন বিল নিতে কিংবা দিতে দেখা গেল তিনি কারো সঙ্গে ফোনে আলাপ করছেন। আলাপের বিষয়বস্তু 'বাজার'। ফোনের অপর প্রান্তে তার স্ত্রী। আলাপের নমুনা নিম্নরূপ—

স্বামী : ছগীররে বাজারে পাঠাইছো?

স্ত্রী : (সম্ভবত 'হ্যাঁ' বলেছে।)

স্বামী : থানকুনি পাতা পাইছে?

স্ত্রী : (সম্ভবত 'হ্যাঁ' বলেছে।)

স্বামী : কেমনে রান্না করবা?

(সম্ভবত স্ত্রী ধমক দিয়েছে, তার কাজে অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে) আচ্ছা ঠিক আছে।তোমার যেমনে খুশি রান্না কইরো।

এভাবে আলাপ চলছে আর প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত অবস্থায় লাইনে দাঁড়িয়ে ঘর্মাক্ত সবাই। লাইন থেকে একজন অস্থির হয়ে বলে উঠলেন, 'এই যে ভাই গরমে সিদ্ধ হইয়া গ্যালাম আর কতক্ষণ।'

কর্মচারীর নির্লিপ্ত উচ্চারণ,

'এক মিনিট।'

পরবর্তী সময়ে এই এক মিনিট যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন ধাক্কাধাক্কি, হাতাহাতি ও মারামারিতে গিয়ে শেষ হল। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে সময়ে যা সুন্দর, অসময়ে তা আবেদনহীন এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা দুঃখজনক। জিটিভি দিয়ে শুরু করেছিলাম এ লেখা। আবার সেখানেই ফিরে যাচ্ছি। এক মিনিটের প্রতিযোগিতায় এসে অনেকে এই এক মিনিটে অনেক কিছুই করতে পারেন এবং বিজয়ী হয়ে লাভ করেন পুরস্কার। এ যেন সময়কে উপভোগ করা অর্থাৎ ইচ্ছে করলেই আমরা সময়কে কাজে লাগাতে পারি। কাজে লাগাতে পারি প্রতিটি মুহূর্তকে। রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি দিয়ে এ লেখার ইতি টানবো, 'প্রকৃতি ক্রমাগতই আমাদের এক হইতে একান্তরে লইয়া যাইতেছে, এক কাড়িয়া আর এক দিতেছে। আমাদের শৈশবের 'এক' যৌবনের 'এক' নহে, 'ইহকালের 'এক' পরকালের 'এক' নহে এইরূপ শতসহস্র একের মধ্য দিয়া প্রকৃতি আমাদিগকে সেই 'এক' মহৎ 'এক' এর দিকে লইয়া যাইতেছে।" সুতরাং এখনো সময় আছে রাস্তাঘাটে ছিনতাই নয় আমাদের ছিনতাই করতে হবে 'সময়কে' সড়ক অবরোধ নয়, সময়কে অবরোধ করতে হবে, প্রতিটি মিনিট কাজে লাগাতে হবে। উপভোগ করতে হবে সময়কে। কারণ আজকের এই এক মিনিট কাল আর আসবে না।

আপনি কি সত্যি বলছেন?

তর্কের দ্বারা তর্ক মেটে না, উপদেশের দ্বারা সংস্কার ঘোচে না, সত্য যখন ঘরের কোণায় একটু শিখার মতো দেখা দেয় তখনই ঘরভরা অন্ধকার আপনি কাটিয়া যায়।—বলেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তথাপিও আমরা প্রতিনিয়ত যত্রতত্র কবর দিচ্ছি সত্যকে। মিথ্যে দিয়ে মিথ্যেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য করছি তর্ক। সত্য উধাও। এখন ছোটরা এবং বোকারাই এখানে সত্য কথা বলে। একজন বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানী (!) ব্যক্তি সত্য বলছেন—ভাবাই যায় না। যিনি সত্য বলেন বা বলার চেষ্টা করেন তিনি বোকা। অথচ আমরা বলি আজ হোক কাল হোক সত্য একদিন উদঘাটিত হবেই। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ো না। অসত্যের অহমিকা ক্ষণস্থায়ী। সত্যের অহংকার চিরস্থায়ী। এসবই এখন নীতিকথা শুনলে অনেকেই মুখ টিপে হাসেন। চারদিকে মিথ্যের জয় জয়কার। এর মধ্যই বেঁচে থাকা।

মিথ্যের উন্নতি। সত্যের অবনতি। অতএব মিথ্যে বল, উন্নতি হবে। এটাই এখন রীতি। একটা সময় ছিল সত্য বললে প্রশংসা হতো। সত্যবাদীকে সম্মান করা হতো। অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতিও সত্যের ভয়ে ছিল ভীত। এখন সত্যকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। যার ফলে মিথ্যের গ্রাসে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নেমে এসেছে অন্ধকার। একটু তলিয়ে দেখা যাক—টিভিতে, ছবিতে, রেডিওতে ও পত্রিকাতে যেসমস্ত সামগ্রীর বা পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখা যায় এবং তার জন্য যেসব ভাষা প্রয়োগ করা হয় তা কি সত্যি? যেমন ধরুন—

১. একশ ভাগ গ্যারান্টি সহকারে "অমুক" তেল আপনার মাথার চুল কালো করবে।

২. ত্বকের যত্নে "অমুক" ক্রীম অতুলনীয়।

৩. পরিবারের সবার পছন্দ 'অমুক' শ্যাম্পু।

৪. 'অমুক' টুথপেস্ট মানেই আপনার দাঁত হবে মুক্তার মত ঝকঝকে-তকতকে।

৫. বাজার কাঁপাতে এল 'অমুক' সাবান।

৬. দুধের সেরা দুধ 'অমুক' দুধ।

এবারে ওষুধে আসা যাক—

১. লম্বা বেঁটে হতে হলে এবং বেঁটে লম্বা হতে হলে চলে আসুন 'অমুক' স্থানে।

২. মেদ ভুঁড়ি থেকে ১ মাসেই অপূর্ব সুফল লাভ (বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের ছবি দিয়ে এ সম্পর্কিত স্বীকৃতি প্রদান করে পত্রিকায় বক্তব্য দিয়ে থাকেন)

৩. আধুনিক প্রযুক্তিতে ভেষজ চিকিৎসার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াখানা অমুক।

৪. যাদের মাথায় চুল নেই, অথবা চুল পড়ে যাচ্ছে কিংবা চুল আকর্ষণীয় নয় তারা 'অমুক' তেল ১০০% গ্যারান্টি সহকারে ব্যবহার করুন।

৫. এলোপ্যাথি যা পারে নি—আমাদের এই ভেষজ ওষুধ মন্ত্রশক্তির ন্যায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে সুস্থতা দেবে।

৬. স্ত্রী-পুরুষ যৌন ব্যাধির প্রতিকার ও ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে অত্যাশ্চর্য চিকিৎসা পদ্ধতি যা আপনার দীর্ঘদিনের লালিত অসুখের প্রতিকার করবে ২৪ ঘণ্টায়।

এবারে ছায়াছবির বিজ্ঞাপনে আসুন—

১. "ইহা" এমন এক ছবি যা একবার দেখলে বারবার দেখতে ইচ্ছা করে।

২. 'ইহা' একটি ঐতিহাসিক ছবি। (কসের জন্য ঐতিহাসিক তা কেউ বুঝতে পারেন না)

৩. বাংলাদেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ছবি (অনেক ছবির বিজ্ঞাপনেই এমনটি থাকে সুতরাং কোনটা সবচেয়ে ব্যয়বহুল তা বোঝার উপায় কি?)

৪. পরিবারের সবাইকে নিয়ে দেখার মত ছবি। (এ কারণেই কি পরিবারের সবাই একসাথে সব ছবি দেখেন না)?

৫. 'অমুক' তারিখে দেশ কাঁপাতে আসছে 'অমুক' পরিচালিত 'অমুক' ছবি। (ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ নয়তো?)

৬. মুক্তির মিছিলে একটি বিস্ফোরণ—মন মাতানো, হৃদয়স্পর্শী, অভিনয় সমৃদ্ধ ছবি।

৭. দেশকে ভালোবাসার একটি দেশাত্মবোধক ছবি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবারে পত্রপত্রিকায় আসুন।

১. নিরপেক্ষ দৈনিক।

২. সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের জন্য 'অমুক' পত্রিকা।

৩. নির্মল বিনোদনের সাপ্তাহিক কিংবা পাক্ষিক।

৪. সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বলিষ্ঠ মুখপত্র।

৫. দেশকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে বাঁচাতে হলে পড়ুন "অমুক" পত্রিকা।

এ ছাড়াও সরকারি প্রেসনোট, রাজনৈতিক নেতাদের ভাষণ, মোড়লের সালিসি, কর্মকর্তার ফাইলে চালানো কলম, একটি আদর্শ সংগঠনের আদর্শের বাণী, দোকানে একদর বা ফিক্সডপ্রাইজ। এগুলো কি সত্যের উপমা বলে মনে হয়?

উপরে যে উদাহরণগুলো দেওয়া হল এ ধরনের হাজারো উদাহরণ রয়েছে আপনার আশেপাশেই। আপনি নিজের মনকেই প্রশ্ন করুন, বেরিয়ে আসবে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা কিংবা তাদের বলা বা লেখা এই কথাগুলো সত্য কি না। বিভিন্ন হাসপাতালে লেখা থাকে 'সেবাই ধর্ম' 'পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন' ইত্যাদি, ইত্যাদি। অথচ গিয়ে দেখুন আপনার আকাংক্ষিত সেবা হয়তো পাচ্ছেন না আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা নাইবা বললাম। এ ধরনের সত্য বা মিথ্যের অনেক উপমা দেয়া যায়। যার ফলে দেখা যায় আমরা মোটামুটি একটা মিথ্যের জগতে বসবাস করছি। সবাই মিথ্যের মহাজন। চারদিকে মিথ্যের কারবার। সুতরাং মিথ্যের এই জগৎসংসারে কেউ যদি সত্য বলেই ফেলে তাকে বলা হয় বোকা কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক, অবুঝ। সমঝদাররা সত্য বলে কী করে? সেতো বোকা নয়। মিথ্যে প্রতিশ্রুতিকে সত্য ভেবে অসহায় লোক ভোট দেন। ভোট প্রাপ্তির ফসল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ। কিছু করার নেই। এটাই নিগুঢ় বাস্তব। এটাই সত্য। এই সত্যকেই মিথ্যে (?) বললে উপায় নেই। তারপরও বলবো, এই মিথ্যে পাপ। আর এই পাপ কোনদিন চাপা থাকে না। একদিন না একদিন সত্য বেরিয়েই আসবে। তা কোন অসতর্ক মুহূর্তে হলেও।

এই প্রসঙ্গে ছোট্ট একটি গল্প মনে পড়ে গেল—অন্তিম শয্যায় শুয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন শ্যালিকা। তার শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী দুলাভাইকে ডেকে তাকে মৃত্যুকালীন জবানবন্দী দিতে গিয়ে বলল, 'দুলাভাই, আমি তো চলে যাচ্ছি, কিন্তু মরার আগে আপনার সামনে আমার সমস্ত দোষ, পাপ খণ্ডন করে যেতে চাই, এবার সব সত্যি স্বীকার করে যেতে চাই—এটাই আমার শেষ ইচ্ছা। এবার শুনুন, 'আপনার স্টীল আলমারি থেকে ১০ হাজার টাকা চুরি করেছিলাম আমি, আমিই আপনার বন্ধুর সঙ্গে লুকিয়ে চুপি চুপি প্রেম করতাম, ঘুরতাম, ফিরতাম এবং আপনার অফিসের গোপন খবরগুলো বাসায় জেনে তাকে জানিয়ে দিতাম। আমিই আপনার ঘুষ খাওয়ার বিষয়টা দুর্নীতি দমন বিভাগকে জানিয়েছিলাম। আমিই আপনার ব্ল্যাকমানির হিসাবটা ইনকাম ট্যাক্স অফিসের কাছে বলেছিলাম। আমিই আপনার বারোটা বাজানোর জন্য ...।' শালীর কথা শেষ করতে না দিয়েই দুলাভাই ধরা গলায় অত্যন্ত কোমল স্বরে বললেন,

'থাক থাক ওসব কথা ছেড়ে দাও, এখন ওসব পুরোনো কথা ভুলে যাও। যা হয়েছে, হয়ে গেছে, তুমি যেমন ভুল করেছ, আমিও তেমনি ভুল করেছি। আমিই তোমার খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম। যার জন্য তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ। কাজেই ওসব কথা মনে করে দুঃখ করে কী লাভ বল। দুঃখ কর না।'

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, সত্য যে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে আপন মহিমায় বেরিয়ে আসে এবং আসবেই। তখন আর কিছুই করার থাকে না। তাই অনুরোধ, কোন কিছু বলার আগে একটু চিন্তা করুন—ভেবে দেখুন, আপনি কি সত্যি বলছেন?

বিকশিত দন্ত

আপনি কি কখনো পারবেন এরকম একটি মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী করতে যার দাঁত নেই? পারবেন না। কারণ অধিকাংশ পুরুষই কাপুরুষ। মুখে যতই বলুক আমি 'সুপুরুষ।' পারব পারব যতোই চেঁচান না কেন মনের আবেগ কণ্ঠে এসে থেমে যাবে। দাঁত এমনই এক জিনিস বা বস্তু—যার আছে সেও বোঝে, যার গ্যাছে সেও বোঝে। এই দাঁতকে ঠিক রাখার জন্য কত চেষ্টা, কত বিজ্ঞাপন, কত মডেলিং, কত পেস্ট, পাউডার, কয়লা, ছাই। রয়েছেন দাঁতের রোগ চিকিৎসার জন্য দন্ত চিকিৎসক। দাঁত কত প্রকারের? ম্যালা। ফোকলা দাঁত, উঁচু দাঁত, পোকা দাঁত, ঝকঝকে দাঁত, বাঁকা দাঁত, সোজা দাঁত, অবশেষে বাঁধানো দাঁত। রোগাক্রান্ত দাঁতের আবার ভিন্ন নাম রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে আক্কেল দাঁত। দাঁত আপনার আনন্দ, আবার দাঁতই আপনার দুঃখ। বেঢপ আকৃতির দাঁত আপনার সুশ্রী চেহারাকে কুশ্রী করে দিতে পারে। গায়ে—হলুদের দিনে কনের ছোট বোন মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসাতে বেয়াইন বেয়াইরা পিছু লাগল—

: কী হল? সেই যে সন্ধ্যা থেকেই হাত, না হয় শাড়ির আঁচল মুখে দিয়ে রেখেছেন ব্যাপারটা কী?

: কই কিছু না। এমনি। মুখে হাত চাপা দিয়েই কনের বোন উত্তর দিল।

: কিছুই যখন না, তখন খুলুন।

সবাই মিলে জোর করে বেচারির হাতটা মুখ থেকে সরাল। তারপরের চিত্র অন্যরকম। তার হাসি উধাও। অন্যেরা লজ্জিত। কারণ দাঁত। মেয়েটির দাঁত ছোট কিন্তু উঁচু। দাঁতের বেঢপ আকৃতির কারণে ঠোঁট দুটো জোড়া লাগাতে কষ্ট হয়। তাই সবসময়ই মনে হয় সে হাসছে। কারণ দাঁত। দাঁতের যত্নে তাই সবাই খুব ব্যস্ত থাকেন। সকালে বিকেলে দুবেলাই অনেকে দাঁত ঘষেন। কারণ যার দাঁতে একবার রোগ ধরে কিংবা পোকায় আক্রমণ করে, তাহলে যে ব্যথা হয় তাতে ঘুম হারাম। আরামও হারাম হয়ে যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে আপন লোকটির মিষ্টি কথাও মিষ্টি

লাগবে না। যদি লাইগ্যা যায়–এর ৩০ লাখ টাকার সংবাদও তখন আনন্দ দেবে না। কারণ দাঁতের ব্যথা বড় ব্যথা।

একটি অফিসে এক ব্যক্তি জনৈক কর্মকর্তার সঙ্গে জরুরি আলাপ করতে এসেছেন। যতবারই ভদ্রলোক কথা বলছিলেন ততবারই কর্মকর্তা নাকে হাত দিচ্ছিলেন। যতবারই ভদ্রলোক কথা বলার জন্য মুখটা বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন ততবার কর্মকর্তাও পেছনে সরে যাচ্ছিলেন। কারণ দাঁত। ঐ ভদ্রলোকের দাঁতে এক ধরনের রোগ হওয়ায় প্রচুর দুর্গন্ধ আসছিল। এ–ধরনের পরিস্থিতিতে আপনারাও হয়তো অনেকে পড়েছেন। খুব নিকট আত্মীয়, প্রেমিকা, স্ত্রী বা বন্ধুর এই রোগ থাকলে খুব সমস্যায় পড়তে হয়। কারণ অবস্থাটা হয় 'না পারি কইতে, না পারি সইতে।' অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যার মুখ বা দাঁত থেকে এ ধরনের দুর্গন্ধ নির্গত হয় সে কিন্তু নির্বিকার। সম্প্রতি এ–ধরনের পরিস্থিতিতে আমিও পড়েছিলাম। সে–কারণেই এ লেখার উৎপত্তি। একবার ভেবেছিলাম ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করি—আপনি যে এত ঝুকে কথা বলছেন আপনার মুখ নিঃসৃত দন্ত পাইওরিয়াজনিত (নাকি?) দুর্গন্ধে আমার দম আটকে যাওয়ার মত অবস্থা হচ্ছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে বলুন। জ্যারা হাটকে! কিন্তু ভয় এবং লজ্জায় বলি নি। সুতরাং আপনার অজান্তেই অনেক ক্ষেত্রে দাঁত আপনার ব্যক্তিত্ব, সম্মান ডুবিয়ে দিতে পারে। সুতরাং দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝতে হবে। কারণ দাঁতের ওপর আমাদের মর্যাদাও অনেকখানি নির্ভরশীল। তাই বলে ভাববেন না—আমি কোনো দন্ত চিকিৎসকের হয়ে কাজ করছি।

দাঁত ভালো থাকলে, ঝকঝকে চকচকে থাকলে দন্ত বিকশিত করে রাখা যায়। নইলে চোরা হাসি দিতে হয়। কারণ কোন ফাঁকে ঠোঁট গলে আপনার অসুস্থ দাঁত বেরিয়ে পড়বে কে জানে। সুন্দর দাঁতের হাসিকেই মিষ্টি হাসি বলা হয়। কারণ হাসলে দাঁত দেখা যায়। ঝকঝকে দাঁত চেহারায়ও কিছুটা মাধুর্য আনে। নাটকে–যাত্রায় কৌতুক করার জন্য মাঝে মাঝে দুই পাটি দাঁতের মাঝখানের দুটি দাঁতে রং লাগিয়ে দেওয়া হয়। ছবি তুললে মনে হয় ও দুটো দাঁত নেই। তখন চরিত্রটি কৌতুকপ্রদ হয়ে যায়। সে জন্যই যাদের দাঁত নেই তারা দাঁত বাঁধাই করে নেন। বয়স যতোই হোক না কেন, যার দাঁত নেই সে নাকি বুড়ো। মহিলা হলে বুড়ি। সুতরাং দাঁত আপনার বয়সেরও মাপকাঠি। দন্ত হাসি কিন্তু আবার রাগেরও কারণ ঘটায়—ছোটবেলায় অনেক শিশু স্কুলে বসে একজন অপরজনের জামার কলার ধরে টান দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে। এ দৃশ্য দেখে অন্যেরা হিঃ হিঃ করে হেসে ওঠে। আর যায় কোথায়! মাস্টার সাহেব রেগে ওঠেন।

: দাঁত বের করে হিঃ হিঃ করছ। ঘটনা কী?

সুতরাং দাঁত আপনার সুখ, দাঁত আপনার দুঃখ। আমাদের অনেকের আবার আক্কেল দাঁতও ওঠে। ওটা বাড়তি দাঁত। কেউ কেউ বলেন, ওটা নাকি যাদের আক্কেল জ্ঞান কম তাদের বেশি ওঠে। এ কথা বোধহয় সত্যি নয়। ইদানিং নাকি প্রচুর লোকের আক্কেল দাঁত উঠছে। কারণ আমাদের আক্কেল বুদ্ধি নাকি দিন দিন নিচের দিকে যাচ্ছে। অর্থাৎ কমছে। তথাপিও আমরা হাসি। দাঁত বের করে হাসি। তাই কেউ কেউ উত্তেজিত হয়ে দাঁতের ওপর প্রথম আক্রোশ ঝাড়েন,

: এক ঘুষিতে তোমার দাঁত ফেলে দেব।

যত দোষ নন্দ ঘোষ। দাঁত কি দোষ করেছে। কিছুই নয়। তবুও দাঁতের ওপর আক্রমণাত্মক হুমকি। কারণ দাঁত গেলে সবই গেল। বয়স গেল, খাওয়া গেল ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনিচ্ছাকৃতভাবে কিংবা জন্মসূত্রে যাদের দাঁতের এসব দোষ আছে তাদের খাটো করা আমার উদ্দেশ্য নয়। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে সঠিক সময়ে দাঁতের যত্ন না নিয়ে দাঁতের এ হাল করেছেন তাদের উদ্দেশ্যেই এ লেখা।

দাঁত নিয়ে এতো কথা লেখার কারণ একটিই—দাঁত থাকতে আমরা দাঁতের মর্যাদা বুঝি না। অথচ বক্তৃতা, বিবৃতি, নোট, প্রেসনোট, আলোচনা, সমালোচনা তর্ক-বিতর্ক, ঘটনা, দুর্ঘটনা অনেক কিছু দেখে কিংবা শুনে আমরা এই দাঁত বের করেই হাসি। সেই হাসিতে অন্তরের ও মুখের কোন অভিব্যক্তি থাকে না। দাঁতটাই সেখানে মুখ্য। দুই পাটি অভিব্যাক্তিহীন দাঁত হাসির উপস্থাপনে যথাযথ ভূমিকা পালন করে সবাইকে বুঝিয়ে দেয় আমরা হাসছি। দন্ত মোদের বিকশিত।

ঘুষের দৌরাত্ম্য

শিশুদের প্রশ্নের শেষ নেই, জবাব দিয়েও তাদের অনেক সময় তৃপ্ত করা যায় না। আবার শিশুদের কিছু কিছু প্রশ্ন রয়েছে যা অনেক সময় বড়দের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়। এবারে তেমনি একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। ৮ বছরের শিশু রাজীব একদিন তার বাবাকে জিজ্ঞেস করে বসে—

: আচ্ছা আব্বু তুমি তো শুনেছি অল্প বেতনে চাকরি কর। তুমি এত সুন্দর বাড়ি বানালে কী দিয়ে? তুমি কি ঘুষ খাও আব্বু?

: না—এই টাকা তোমার দাদা রেখে গেছে।

: দাদা এত টাকা কোথায় পেল?

: তোমার দাদা? (থতমত খেয়ে) সেটা তো তার বাবা তার আমলে রেখে গেছে।

: কিন্তু আব্বু—দাদার বাবা এত টাকা পেল কোথায়?

: তোমার দাদার দাদা তার জন্য টাকাগুলো রেখে গিয়েছিল।

: ভালো, খুব ভালো, আমাদের বংশে টাকা কখনো অচল হয় না, তাই না আব্বু?

বাবা নিরুত্তর। কারণ উত্তর দেবার ভাষা নেই। অন্য কোনো দিকে উন্নতি না হলেও আমাদের দেশে ঘুষের ব্যাপারে অর্থাৎ এর লেনদেন প্রক্রিয়ায় বেশ উন্নতি হয়েছে। কারণ খাদ্য না হলেও এই জিনিসটি প্রচুর খাওয়া হয়। ঘুষে পেট ভরে না। কিন্তু মন ভরে। প্রতিপত্তি বাড়ে। ঘুষে গাড়ি হয়, ঘুষে বাড়ি হয়। ইদানিং ঘুষ টাকা-পয়সার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ঋতুভিত্তিক ঘুষও রয়েছে। যখন যে ফলের সিজন আসে তখন সেই ফল ঘুষ হয়ে আসে। যখন যে মডেলের গাড়ি আসে তখন সে গাড়ি ঘুষ হয়ে আপনার কাছে চলে আসবে। ইদানিং ঘুষ হিসেবে ফ্ল্যাটও পাওয়া যায়। সুতরাং যত অন্যায় আবদারই থাক না কেন ঘুষের ক্রমোন্নতিতে সেই অন্যায়কে ন্যায় করতে পারবেন। ঘুষের শ্রেণীবিভাগ আছে, লোক ও পদ ভেদে অর্থাৎ চেয়ার ভেদে কিংবা বলা যায় চেয়ারের ক্ষমতা ভেদে এর পরিমাণ ওঠানামা

করে। বাংলাদেশে এক টাকা থেকে লক্ষ-কোটি টাকাও ঘুষ দেয়া-নেয়া হয়। বড় সাহেবের সাক্ষাৎ লাভের জন্য 'পকেটে ভাংতি নাই' এই দোহাই দিয়ে যেমন এক টাকায় পার পেতে পারেন তেমনি পাঁচ কোটি টাকার কাজ হাসিল করতে এক কোটি টাকার 'ঘুষ' দেয়াও বিচিত্র নয়। যারা দেয় তারা জানেন 'দিলেই হবে'। আর যারা নেন তারা জানেন 'আটকে দিলেই পাব।' যার ফলে অফিস-আদালতগুলোতে এই আট্‌কা আটকির খেলা চলছে। কাজের গতি হয়ে যাচ্ছে মন্থর। কিছু কিছু কর্মকর্তা আছেন যারা আপনার ন্যায়সঙ্গত ফাইলটি আটকে রেখে অনেক সময় বলেন, 'কিচ্ছু জানি না?। অথচ এই 'ঘুষ' খাওয়ালেই দেখা যাবে 'উনিই সবচেয়ে বেশি জানেন'। দ্রুত ঘুষ পাওয়ার স্বার্থে প্রয়োজনে আপনাকে বাড়ি থেকে খবর দিয়ে আনবে। কিংবা নিজেই ফাইল নিয়ে রওয়ানা হবে আপনার গৃহপানে। আমাদের দেশে ঘুষ উন্নত প্রযুক্তি। যে কাজ হয় না, বা হবে না বলে আপনি মনমরা হয়ে ফ্রাস্টেশানে ভুগছেন তার জন্য উত্তম রাস্তা ঘুষ। ঘুষ দিন। কাজ নিন। কে বলে দেশে কাজের অভাব, চাকরির অভাব, অর্থের অভাব? সবই আছে। শুধু প্রয়োজন ঘুষের। ঘুষের বিরুদ্ধে অনেক বলা হয়েছে, লেখা হয়েছে কিন্তু কারো হুঁশ ফেরেনি। বরং ঘুষ চলছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। ফিরে আসা যাক ঘুষের একাল ও সেকালে। অতীতের চাইতে বর্তমানে ঘুষ গ্রহণ পদ্ধতির কী পরিমাণ উন্নতি হয়েছে বা হতে যাচ্ছে তা নীচের চিত্রটি থেকে কিছুটা হলেও আঁচ করা যাবে।

অতীতের চিত্র

এক ব্যক্তি টেবিলের নীচ দিয়ে ঘুষ দিচ্ছিলেন। কর্মকর্তা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঘুষদাতাকে সতর্ক করছেন—এই যে ভাই কী শুরু করেছেন, একেবারে অফিসের মধ্যেই শুরু করে দিলেন? বিকেলে বাসায় এসে দিয়ে যাবেন। কেউ দেখে ফেললে বিপদ হবে।

বর্তমানের চিত্র

এক ব্যক্তি জনৈক কর্মকর্তাকে টেবিলের নিচ দিয়ে ঘুষের অর্থ দিতে গেলে কর্মকর্তা ধমকে উঠেন—

: কি ব্যাপার অমন চোরের মত আচরণ করছেন কেন?

: না মানে কেউ দেখে ফেললে লজ্জার ব্যাপার হয়ে যাবে। ভদ্রলোক কাঁচুমাচু হয়ে জবাব দিলেন।

: দুর সাহেব। কিসের লজ্জা। আমার প্রাপ্য আমাকে দেবেন এতে কার কী বলার আছে? এত লুকোচুরির কী হল? টেবিলের উপর দিয়েই দিন।

বর্তমানে ঘুষ গ্রহণ পদ্ধতি আরো আধুনিক এবং বেপরোয়া হয়েছে। গোড়াতেই বলেছি আর কিছুর উন্নতি হোক বা না হোক ঘুষের উন্নতি হচ্ছে। এই ধারায় চলতে

থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তা কল্পনায় অনেকটা এরকম—

টেবিলের উপর স্ট্যান্ডে ঘুষের রেট লেখা থাকবে এভাবে—

: ফাইল অনুযায়ী ঘুষের হার :

১। ফাইল কার কাছে আছে জানতে হলে সংবাদদাতাকে দিতে হবে ২০০ টাকা।

২। ফাইলের কাজ হাতে হাতে করাতে হলে টেবিল প্রতি ঘুষ ২০০০ টাকা।

৩। এক সপ্তাহের মধ্যে ফাইল ছাড়াতে হলে টেবিল প্রতি ঘুষ ১০০০ টাকা।

৪। ১৫ দিনের মধ্যে ফাইল ছাড়াতে হলে টেবিল প্রতি ঘুষ ৫০০ টাকা।

৫। ১ মাসের মধ্যে ফাইল ছাড়াতে হলে টেবিল প্রতি ঘুষ ৩০০ টাকা।

৬। এক মাস পরে হলে ফাইল গায়েব হবে এবং এই গায়েবি ফাইল উদ্ধার করতে হলে সর্বমোট ৫০০০ টাকা লাগবে।

নীচে বিঃ দ্রঃ হিসেবে লেখা থাকবে ফাইলের গুরুত্ব অনুযায়ী আলোচনা সাপেক্ষে ঘুষের পরিমাণ কিছুটা কম বেশি করা যাবে।

এই অবস্থা যে শুরু হয় নি তা নয়। তবে কিছুটা গোপনে চলছে এবং ব্যাপারটি ওপেন সিক্রেট হিসেবে চালু রয়েছে। কিন্তু 'ওপেন সিক্রেট' থেকে যখন সিক্রেট শব্দটি চলে যাবে তখন অবস্থাটা কী হবে?

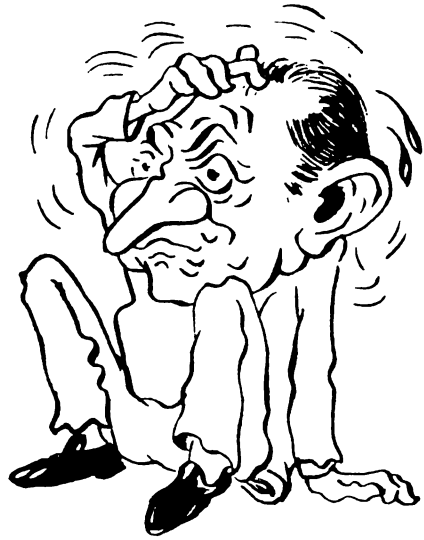

হায় রে উন্নতি

সবার মধ্যেই একটি 'হায় হায়' ভাব।

হতাশা।

কোথায় আছি

কিভাবে আছি।

ভবিষ্যতে কী হবে।

যার আছে তিনিও হায় হায় করছেন, যার নেই তিনি তো করছেনই। গ্রামেগঞ্জে এই হায় হায় 'হা হুতাশে' রূপ নিয়েছে। নেতার বক্তৃতায়, বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধির কলমে, লেখকের লেখায়। শিল্পীর গানে। সবকিছুতেই হতাশা। হাহাকার। কেউ কেউ বলেন আমাদের দেশ সবুজ-শ্যামল-সুজলা-সুফলা। এমাটিতে যা-ই লাগাবেন সোনা হয়ে ফলবে। অথচ আমাদের উন্নতি হচ্ছে না। যাদের হাতে উন্নয়নের চাবিকাঠি তারাও বলছেন উন্নতি হচ্ছে না। আর যারা নিজেদের উন্নয়ন স্বচক্ষে দেখে যেতে পারবেন কি না সন্দেহ, তারা তো বলবেনই (গরীব দুঃখীর কথা বলছি) কমবেশী সবাই যেন ভিক্ষার ওপর চলছি। কেউ 'হাই ক্লাস ফকির' কেউ বা 'লো ক্লাস ফকির।' কিছুদিন আগে শোনা একটি গানের দুটি লাইন এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল—'লো ক্লাস ফকিরেরা না খেয়ে কুঁজো,

হাই ক্লাস ফকির কারা নিজেই তো বুঝো।'

সুতরাং ক্লাস ভিত্তিক ফকিরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ফকিরদের সম্পর্কে সবারই কমবেশী ধারণা আছে। যদিও ছেঁড়া কাপড় পড়ে দ্বারে দ্বারে কিংবা উন্মুক্ত রাস্তার পাশে ছালার চট গায়ে দিয়ে উপুড় হয়ে 'আল্লাহ' আল্লাহ' স্বরে যারা ভিক্ষা করেন তাদেরকেই আমরা ফকির হিসেবে চিনি। কিন্তু এ ছাড়াও বহু ধরনের ফকিরে দেশ ভরপুর। শুধু তাই নয়, এদের ভিক্ষার ভঙ্গিও ভিন্নরকম। এ জাতীয় ফকিরেরাও এসব ভঙ্গির নামকরণ করেছে স্টাইল। একজন মানুষের বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা, বোধবুদ্ধি ও সচেতন প্রয়াস থেকে স্টাইল সৃষ্টি হয়, যা

সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির স্বকীয় সম্পদ। যা তার বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। এইসব ফকিরদের এই জাতীয় স্টাইল স্বতঃস্ফূর্ত নয়—সচেতনভাবে অর্জিত। স্টাইলের ধর্মও তাই। সুতরাং যতোই ভদ্রলোক সেজে থাকুন না কেন, ব্যক্তির স্টাইলই তাকে পরিচিত করে তোলে। কোন কোন অফিসে গেলে পিয়ন থেকে শুরু করে বড় সাহেব পর্যন্ত কাজ করে দেয়ার অঙ্গীকার করে 'ঘুষ' নামে যা গ্রহণ বা দোহন করে তাকে 'ভিক্ষা' বলা হয়। একজন ভিক্ষাদাতা, একজন ভিক্ষাগ্রহীতা। যিনি ভিক্ষা গ্রহণ করেন তাকেই ফকির বলা হয়।

এই 'ঘুষ' ভিক্ষা আমাদের সমাজের প্রতিটি স্তরে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। আগে টেবিলের তলা দিয়ে কিংবা গিফটের প্যাকেটে অথবা ভাবি সাহেবাকে খুশি হয়ে কিছু দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইদানীং টেবিলের ওপর দিয়ে চলছে। শুধু তাই নয় ঠিকাদারী করতে হলে কর্মকর্তা কর্মচারিদের জন্য শতকরা হিসেবে কিছু রাখতে হয়। কোন কোন অফিসে আবার ঘুষের দালালও রয়েছে। এদের কাজ উভয় পক্ষের মধ্যে 'লিয়াজোঁ' রক্ষা করা। রাজনৈতিক দলের লিয়াজোঁ কমিটি মাঝে মাঝে সমস্যার সমাধান করতে না পারলেও এইসব দালালরা আবার লিয়াঁজো এক্সপার্ট। অর্থাৎ মক্কেল ফাঁসবেই, বিনিময়ে তার হাতেও আসবে কিছু পারসেন্টেজ। এই যদি হয় অবস্থা তাহলে উন্নতি হবে কী করে? দেশের সার্বিক অবস্থার উন্নতি নাহলেও ঘুষের উন্নতি হয়েছে। আগে যেখানে ৫ টাকা লাগত এখন সেখানে ৫০ টাকা লাগে। আগে যেখানে ৫ হাজার লাগত এখন সেখানে ৫০,০০০ লাগছে। মানুষ দিচ্ছে, ওরা নিচ্ছে। দাতা ও গ্রহীতার এই চাওয়া পাওয়ার খেলায় জাতি হারাচ্ছে 'উন্নতির স্বাদ।' রাস্তা মেরামত, সরকারি কোয়ার্টারের রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা ইমারত নির্মাণ, সেতু নির্মাণ-উন্নয়নের জন্য ঠিকাদারের প্রয়োজন। আবার নির্মাণ কাজের জন্য রড, সিমেন্ট, বালি ইত্যাদি নির্মাণ সামগ্রী প্রয়োজন। নির্মাণ সামগ্রী আবার দুই নম্বরও আছে। এক নম্বরও আছে। দুই নম্বরের দাম কম, এক নম্বরের দাম বেশি। সবাই চায় ব্যক্তিগত উন্নয়ন। সুতরাং এক নম্বরের চাইতে দুই নম্বর জিনিস দিলে ব্যক্তিগত উন্নয়ন সম্ভব। ভাবছেন বিলে ঘাপলা হবে? না হবে না?

ফকিররা বসে আছে।

আঁখি মেলে হাত খুলে তব পানে,

ঘুষ দিন। বিল নিন।

উন্নয়ন হয়ে গেল।

কার?

তার না জাতির?

হিসাবটা পরিষ্কার। এরপরও এই জাতীয় ব্যক্তিরা হায় হায় করছেন। কারণ

যার আছে তার আরো চাই আর যার নাই তারতো চাই-ই। এখন কথা হচ্ছে উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় কী? এবং কিসে উন্নতি সম্ভব? দুই উপায়ে পৃথিবীতে উন্নতি লাভ করা যায়, হয় নিজের শ্রম দিয়ে নতুবা অন্যের বোকামী হতে শিক্ষা লাভ করে। কোনটি গ্রহণ করব আমরা, দ্বিতীয়টি গ্রহণ করার কোনো অবকাশ নেই।

কারণ আমাদের দেশে এমন লোক পাওয়া খুব কঠিন যিনি নিজেকে বোকা মনে করেন পাশাপাশি অন্যকে বোকা মনে করেন, এমন লোকের সংখ্যা প্রচুর। সুতরাং এক্ষেত্রে বোকা বা চালাকের আসল সংখ্যা নিরুপণ করা দুষ্কর। তাহলে প্রথমোক্ত উপায়ই হচ্ছে উন্নতির অন্যতম চাবিকাঠি। অর্থাৎ শ্রম। শ্রম মানে কাজ। কাজ করলে শ্রম দিতে হবে। কাজ করলে ব্যস্ততাও থাকবে। সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে আমরা সবাই ব্যস্ত। সফল বলেই কর্মজীবী মানুষ ছুটছেন কাজের উদ্দেশ্যে কার্যালয়ে কিম্বা কর্মস্থলে। শিশু কিশোর ছাত্র কিম্বা অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ছাড়া মোটামুটি সবাই কাজে বেরিয়ে পড়েন। ঢাকা শহর এইসব কাজের লোকের চাপে জ্যামের শহরে পরিণত হয়ে যায়। ছুটছে গাড়ি, ছুটছে মানুষ, কোথাও বিশ্রাম নেই, কোলাহলময় নগরী।

কিন্তু আউটপুট কী? হিসেব করলে দেখা যাবে আমরা এত কাজ করেও (!) সামনে এগুতে পারছি না। তাহলে কি দাঁড়াল? আমরা কাজ করছি না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলা যায়, 'আমরা উন্নতির পালে একটু ফুঁ দিতেছি, যতোখানি গাল ফুলিতেছে, ততোখানি পাল ফুলিতেছে না।'

আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে মিছিল করি, মিটিং করি মুখে মিথ্যে প্রতিশ্রুতির খৈ ফোটাই, আন্দোলনের জন্য ঝাপিয়ে পড়ি কাজের বেলায় সেই নিষ্ঠা থাকে কি? বরং কাজ আটকে রেখে আনন্দ পাই। আজকের কাজ আগামীকালের জন্য রেখে দেই। কারণ যতোই দিন যাবে ততোই ঘুষের টাকার পরিমাণ বাড়বে। এই করতে করতে দেখা যাবে এক সময় সেই কাজেরই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। উন্নয়নের প্রধান বাধা চারটি—এক, অতিরিক্ত ভোজনপ্রীতি (দুই) অতিরিক্ত শয়ন (তিন) অতিরিক্ত কথা বলা (চার) সততার অভাব। এই চারটি বিষয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে। বাঁচতে হলে খেতে হবে। তার মানে এই নয় ভরপেট ভাত না খেলে বাঁচা যাবে না। উন্নয়নশীল দেশে সময় বাঁচাবার জন্য অনেকেই 'হাল্কা ফুড' দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজ সারেন। ঘুমের কথা চিন্তা করুন। সারারাত ঘুমিয়েও অফিসে এসে কাজ করার চাইতে স্বীয় আসনে বসে অনেকে ঝিমুতে ভালোবাসে, অথচ বিকেলে বাড়িতে গিয়ে সারা বিকেলই ঘুমাবার প্রচণ্ড অবসর রয়েছে। আর কথার প্রসঙ্গে বড় বড় মনীষীরাই বলে গেছেন—

অনেক কথার অনেক দোষ, ভেবেচিন্তে কথা কোস্।

কবিতায় পড়েছি, 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।' আমরা কথা বলার সময় কম বলি না। কিন্তু কাজ করার সময় কম করি। এরপরে আমাদের যদি বিবেক থাকে—সেই বলে দেবে আমাদের সততা কোন পর্যায়ে রয়েছে।

সূর্যের যেমন তাপ রয়েছে তেমনি একজন সৎলোকের মধ্যেও নির্ভীক দীপ্তি আছে। সততার কাছে দুর্নীতি কোনোদিনই জয়ী হতে পারে না। সুতরাং ভাষণ কিংবা শাসন দিয়ে যেমন উন্নয়ন সম্ভব নয়, তেমনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মিষ্টি কথায়ও উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের উন্নয়ন নির্ভর করছে আমাদের কথায় ও কাজের সততার ওপর।

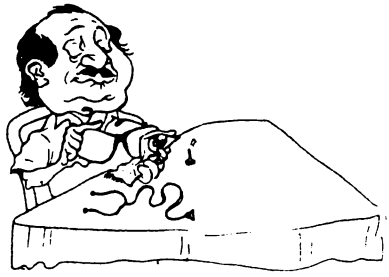

অন্ধজনে আলো দাও

ডাক্তার বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে শুরুতেই তারা যে বিষয়গুলো পরীক্ষা করেন তাহলো প্রেসার কেমন?

মাথা ঘুরায় নাকি?

চোখ, জিহ্বা, গলার অবস্থা, বমির ভাব, শরীরের তাপ ইত্যাদি ইত্যাদি। উন্নত দেশে যে রোগগুলো কদাচিৎ দেখা যায়, এখানে তা প্রায় নিয়মিত। আবার ঐসব দেশে যে রোগগুলো রয়েছে তা আমাদের এখানে তেমন নেই। এর কারণও রয়েছে—ভেজাল খেতে খেতে আমাদের মোটামুটি সয়ে গেছে, যার ফলে খুব নির্ভেজাল জিনিস খেলেই বরং পেটে সমস্যা দেখা দেয় অনেকেরই। এর কারণ কেউ ওটা খেয়ে অভ্যস্ত নয়। তেমনি কোন বিদেশিকে যদি আমাদের দেশের এই মরিচ, হলুদ ও মসল্লা সংযোগে রান্না করা তরকারি পরিবেশন করা হয়, তবে তা মুখে দিয়েই বিদেশি বলে উঠবে, 'ওহ নো, ইটস টু-হট। স্পাইসী।' আর যদি খেয়েই ফেলে কেউ, তবে নির্ঘাত তার শয্যাশায়ী হতে হবে। এসব ভেজাল এবং ঝাল খাবার জন্য 'পেটে অসুখ' আমাদের এখানে একটি নিয়মিত রোগ। সে জন্য ঘরে ঘরে মশার কয়েলের মতো 'ওর স্যালাইন' থাকে। আর এ কারণে নিম্নবিত্তদেরও এক মুঠ গুড়, এক চিমটি লবণ ও আধা সের পানির মিশ্রণ প্রক্রিয়া জানা রয়েছে। আর বিদেশে সব 'খানদানি' অসুখ, হার্ট এটাক, এইডস ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়াও নাম না জানা সব অসুখ যা আমাদের হওয়ার সম্ভাবনা কম। আমাদের দেশের পরিবেশ, আবহাওয়া, সামজিক অবস্থা, আমাদের আচরণ, চালচলন ইত্যাদি অনেক কিছুই এখানে বিভিন্ন রোগের জন্ম দেয়। নিচের সাক্ষাৎকারটি পড়লেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। জনৈক রোগী একবার চিকিৎকের শরণাপন্ন হলেন বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে শুরুতেই ডাক্তার প্রশ্ন করলেন—

: আপনার কী অসুবিধা?

: জিজ্ঞেস করেন কী কী অসুবিধা। কারণ আমার ম্যালা অসুবিধা।

উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিল রোগী।

: জলদি বলেন। ধমকের সুরে বললেন ডাক্তার।

: এইটা মুদির দোকান না ডাক্তার সাহেব। গেলাম, ঝটপট সদাই কিনলাম, বাড়িতে চইলা আসলাম। এইটা চিকিৎসালয়। জীবন পরীক্ষা করেন। অতএব ধীরে এবং ধীরে।

: আপনার কাছে বক্তৃতা শুনতে চাই না। সমস্যা বলুন। ধমকে উঠলেন চিকিৎসক আবারও।

: রাখেন, ধমক দিবেন না। মানুষ অসহায় হয়ে এবং বিপদে পড়ে আপনাদের কাছে আসে। তাই এমন ভাব দেখান যেন আপনি ছাড়া গতি নাই। দেশে ডাক্তারের অভাব নাই। ব্যবহারটা ঠিক করেন। এইবার বলেন কী জানতে চান। রোগীও কম যান না।

: মাথা ঘুরায়?

: ঘুরায়।

; কখন ঘুরায়?

: যখন কোনো ব্যাপারেই কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না তখন। প্রথমে একটা চক্কর মারে। তারপর থেকেই শুরু হয় ঘুরানি।

: প্রেসার কেমন?

: প্রেসারের মধ্যেই তো আছি। চারিদিকেই প্রেসার।

: হুঁ, বমির ভাব আছে?

: হ্যাঁ। ডেইলি কয়েকবার বমি আসে।

: কখন কখন?

: যখন বিভিন্ন ডাস্টবিনের পাশ দিয়ে যাই কিংবা সকালে মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি ওপেন ময়লা লইয়া যায় তখন ডাক্তার সাব, নাকে হাত দিয়াও ঐ গন্ধ থেইক্যা মুক্তি পাই না। ভেতর থেইক্যা ঠেইলা বমিটা আসে। মোড়ে মোড়ে আবর্জনা, পথে পথে প্রস্রাবখানা।

: পেট কামড়ায়?

: সাংঘাতিক কামড়ায়। বিশেষ কইরা দুপুর বেলা।

: কেন?

: কারণ ডেইলি দুপুরে হোটেলে ভাত খাই। আর খাওয়ার পরেই পেটে হাত দিয়া ১৫/২০ মিনিট বইসা থাকতে হয়। ভীষণ কামড়ায়।

: হু—তা ঘুম কেমন হয়?

: একদম-ই হয় না। ডরে কইলজাটা শুকাইয়া থাকে। কখন চুরি হয়। কখন

গ্রীল কাটে। কানটা পাইতা থাকি—স্বল্প আয়ের মানুষ তো?

: শরীরে জ্বালাপোড়া আছে?

: সবসময়ই তো শরীরটা জ্বলে। তবে মাঝে মাঝে এমন জ্বলা জ্বলে যে, মনে হয় শরীর থেইক্যা আগুন বাইর হইতেছে।

: কেন?

: যখন কেউ কেউ চিৎকার কইরা ভাষণ দিয়া বলে—আমরা সব কিছুই জনগণের সুখের জন্য, জনগণের কল্যাণের জন্য করছি। তখন ভীষণভাবে আমার শরীরটা জ্বইল্যা ওঠে।

: বুঝতে পেরেছি। তা বয়স কত হয়েছে আপনার?

: একদম ইয়াং। ওয়ানলি থারটি এইট ইয়ারস। ৩৮ বছরের বৃদ্ধ তরুণ।

: বৃদ্ধ মানে?

: দেখছেন না—বায়ু চড়তে চড়তে মাথার সব চুল সাদা হইয়া গ্যাছে।

: দেখি, চোখটা দেখি।

: চোখ দেইখ্যা লাভ নাই।

: কেন?

: চোখেরই তো সবচাইতে বেশি প্রোব্লেম।

: কিসের প্রোব্লেম?

: .....এই চোখ সবকিছু দেখে—কিন্তু মুখ বুইজা সহ্য করতে হয়। সবকিছুর সাক্ষীই তো ঐ চোখ।

: দেখুন এভাবে বললে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা কঠিন। আপনার কী কষ্ট স্পষ্ট করে বলুন।

: কষ্টের শেষ নাই। সেই সব বলতে গ্যালে আপনে আজকে আর নতুন কোন রোগী দেখতে পারবেন না। সোজা কথা ডাক্তার সাহেব আমি বাঁচতে চাই। আরো কিছুদিন বাচতে চাই। শান্তি মত বাঁচতে চাই।

: শান্তির জন্য কী ঔষধ দেব বুলন?

: কিছুই লাগব না, আমারে রোগ সারনের না, রোগ বাড়নের ওষুধ দেন।

: তার মানে?

: আমার চোখটা অন্ধ কইরা দেন আর কানটা বন্ধ কইরা দেন।

: কী বলতে চাইছেন?

: এ ছাড়া আর শান্তি পাবার উপায় কী?

শ্রদ্ধেয় রাজধানী

পত্র-এক

শ্রদ্ধেয় রাজধানী ঢাকা,

পত্রের প্রথমেই আমার সালাম ও কদমবুচি জানিবেন। আশা করি করুণাময়ের অপার কৃপায় কুশলেই আছেন। আপনাকে পত্র লিখিব এই চিন্তা অনেকদিন হইতেই ছিল। কিন্তু ভয়ে লিখিতে পারি নাই। কারণ কোথায় আপনি আর কোথায় আমরা। তবুও পবিত্র ঈদ উপলক্ষে পত্র লিখিবার সাহস করিতেছি। কারণ ঈদ হইতেছে মহামিলনের দিন। ছোট বড় এই দিনে কোনো ভেদাভেদ নাই। আমি জানি দেশের রাজধানী হিসাবে বুকের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ, রিকশা, গাড়িঘোড়া, অফিস-আদালত লইয়া আপনি খুব ব্যস্ত থাকেন। শুধু এই ঈদের সময় আপনার বুকটা একটু হালকা হয়। কারণ অনেকেই এই সময় আপনার নিকট হইতে আমাদের কাছে ছুটিয়া আসে। তখন আর আপনার বুকে কোনো ট্রাফিক জ্যাম হয় না। আমরা সব সময় আপনাকে বড় ভাই বা মুরব্বীর মত শ্রদ্ধা করি। কারণ বিশ্ববাসী আমাদের দেশের নামের সঙ্গে একমাত্র আপনার নামটা জানে। যদি আপনার কোনো বদনাম হয়, তাহা হইলে পুরাদেশের 'প্রেস্টিজ' লইয়া টানাটানি পড়িবে। তাই আপনাকে লইয়া আমাদের যেইরকম গর্ব হয় সেইরকম ভয়ও হয়। এই সুদূরে বসিয়া কত কথাই তো শুনিতে পাই—ইদানিং নাকি আপনি বেশ কালো হইয়া গিয়াছেন, কল কারখানা ও বিভিন্ন যানবাহনের ধোঁয়ায় নাকি আপনার এই চেহারা হইয়াছে। শুধু কালোই নয়, মাঝে মাঝে আপনার শরীরের বিভিন্ন অংশ হইতে নাকি দুর্গন্ধ বাহির হয়। ইহার কারণ ময়লা আবর্জনা। জানি আপনার করণীয় কিছু নাই। কারণ কয়লা ধুইলেও ময়লা যায় না। সেইরকম আমাদের স্বভাবও পাল্টায় না।

আর আপনার শরীরের বিভিন্ন অংশের প্রয়োজনীয়তাও বিভিন্নরকম। কোথাও

গুরুত্বপূর্ণ আবার কোথাও বা গুরুত্বহীন। যেমন গুলিস্তান, বায়তুল মোকাররম এর উত্তর গেট, দক্ষিণ গেট, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, মানিক মিঞা এভিনিউ, শাপলা চত্বর, মহাখালী মোড় এসব স্থান নাকি জনসভার স্থান হইয়া গিয়াছে। আবার গুলশান, বনানী, বারিধারা, ধানমণ্ডি এইসব এলাকা নাকি হাইক্লাস এলাকা। কারণ এইসব এলাকায় হাইক্লাস লোক থাকে। আবার কমলাপুর, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, তেজগাঁও এইসব এলাকায় কিছু কিছু স্থানে বস্তি রহিয়াছে। এইসব বস্তিতে নাকি 'লো ক্লাস' লোকেরা থাকে। বড় ভাই আমার মাথায় ঢোকে না—একই ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষের মধ্যে এত শ্রেণীবিন্যাস কেন? মানুষের এইসব চরিত্র কি কোনোদিনই ঠিক হইবে না?

আপনার বুকে থাকিয়া অনেকে আবার গর্ব করেন। তিনি রাজধানীতে আছেন, ঈদের ছুটিতে যখন আমার কাছে আসে তখন এক একজনের ভাবের 'ঠেলায়' মেজাজ খারাপ হইয়া যায়। কথায় কথায় বলিয়া উঠে 'আমি ঢাকায় থাকি।' সেদিন আমাদের গ্রামের কুতুব আলী ঢাকা ফেরৎ এক চাপাবাজকে বেধড়ক ধোলাই দিয়াছে। কারণ সে একটি চায়ের দোকানে ঢুকিয়া 'চাপা' মারিতেছিল। কুতুব আলী তাহার এক বন্ধুকে বলিতেছিল, তার এক আত্মীয় একবার পানিতে ডুব দিয়াছিল এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া ডুবিয়াছিল। কুতুবের এই কথা শুনিয়া সবাই আশ্চর্য হইয়া গেল। তখন ঢাকা ফেরৎ সেই চাপাবাজ ফোড়ন কাটিয়া বলে, "এটা আশ্চর্যের কি হলো—আমার এক আত্মীয় একবার পানিতে ডুব দিয়েছিল, বেশ ক'বছর আগে। এখন পর্যন্ত সে উঠেই নাই।' এ-ধরনের অবিশ্বাস্য কথা কুতুব বিশ্বাস করে না এবং প্রতিবাদ করে। এক কথায় দুই কথায় তর্ক বাধিয়া যায়। তর্কের এক পর্যায়ে আপনার কাছ হইতে আসা ব্যক্তিটি কুতুবকে 'আনকালচারড' বলে। ইহাতে কুতুব ধৈর্য্যহারা হইয়া উঠে এবং ঐ ব্যক্তিকে "ধোলাই" দেয়। সবাই কুতুবকে শান্ত করিতে চেষ্টা করে। কুতুবের একই কথা, 'উহাকে কালচার শিখাইতে হইবে'।

আমার বুক হইতে কত লোক আপনার কাছে যায়। কিন্তু কেন? আমি ইহার কোনো কারণ খুঁজিয়া পাই না। কেউ শিক্ষার জন্য যায়, কেউ চাকরির জন্য যায়, কেউ বা যায় ব্যবসার জন্য। কিন্তু যাওয়ার সময় যাকে যেই অবস্থায় দেখিয়াছি, ফেরার পর তাহাদের প্রত্যেকের চরিত্রেই কিছু না কিছু হইলে পরিবর্তন দেখিয়াছি। শিক্ষার জন্য যাহারা গিয়াছে তাহাদের অবস্থা তো সবাই জানেন। মেয়াদ যেন শেষই হইতে চায় না। আমি আর কী বলিব। সেইদিন বড় দুঃখ পাইলাম পুলিশ অফিসার ফরহাদের মৃত্যুর খবর পড়িয়া। চিন্তা করেন ভাই আজ তার নবজাতক শিশু, তার স্ত্রীর কথা।

আমার বুক হইতে ছেলেরা আপনার কাছে গিয়াছে শিক্ষার জন্য। আর কলমের বদলে হাতে নিয়াছে অস্ত্র। যে অস্ত্রে প্রতিনিয়ত কারো না কারো জীবন যাইতেছেই। তবুও যেন কারো বিবেকের দংশন হয় না।

বেয়াদবি নিবেন না ভাইজান—মাঝে মাঝেই সংবাদপত্র পড়িয়া আপনার উপর প্রচণ্ড বিরক্ত হই। রাগ হয়। কারণ কাগজে সমস্ত খবরই প্রায় আপনার। হত্যা, খুন, জখম, মিছিল, মিটিং, গুম, ওয়াকআউট, পদত্যাগ সব ঐখানেই। কিন্তু কথা হইল আপনি আমাদের বড় ভাই। বড় ভাইয়ের যদি এই অবস্থা হয় তাহা হইলে আমরা শিখিব কোথা হইতে। আমার মনে হয় এখন আমাদের উন্নয়ন মুলক কাজ করা উচিত। আপনার বুক হইতে মানুষজনকে ছড়াইয়া ছিটাইয়া দেওয়া উচিত। নইলে যে হারে আমাদের বুক খালি হইতেছে তাহাতে মানুষের চাপে আপনি বিপদে পড়িয়া যাইবেন।

বড়ভাই, আমার বুকে যারা থাকে, আপনার বুক হইতে দেখিলে মনে হইবে ইহাদের বোধ হয় কোনো কাজ নাই। আসলে এই কথা ঠিক নয়। আর কিছু দিতে না পারি মুক্ত বাতাসতো দিতে পারি। আমার কাছে সবাই দম ফেলার সুযোগ পায়। যার ফলে ইদানিং আমার ভূমিকা অনেকটা রেস্ট হাউসের মতো, সবাই বেড়াইতে আসে। বৃদ্ধ মা-বাবা আমার কাছে থাকে। আর ছেলেমেয়েরা চলিয়া যায় আপনার কাছে কাজের আসায়। এই ঈদ বা কোনো দীর্ঘ ছুটি হইলে আমার বুকে ভিড় হয়। বড় ভাই আমি বিস্তীর্ণ জায়গা লইয়া বসিয়া আছি। কৃষকরা আমার বুকে চাষাবাদ করিয়া ফসল ফলায়। তারপর আপনার ঐখানে পাঠায়। আপনার বুকে তো জায়গাই নাই। আমরা কিন্তু খুব নিরীহ। বেকার বসিয়া আছি। ইলেকশনের সময় কেউ কেউ আমাদের কাছে দুইটা ভোটের আসায় ছুটিয়া আসে। বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেন তারা, হেন করেঙ্গা তেন করেঙ্গা। আমার বুকের সহজ সরল মানুষরা তাহাদের নিরাশ করে না। যদিও জানে এই সব নেতাদের চেহারা আগামী নির্বাচনের আগে আর দেখা যাইবে না। আর আপনার ঐখানে ইলেকশনের সময় তো আপনার চেহারাই পাল্টাইয়া যায়। কার বাড়ী কোনটা, খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। সেদিন উত্তর পাড়ার কুদ্দুস মিঞা গিয়াছিল তার এক ভাইয়ের খোঁজে। কিন্তু বাসার নম্বরই খুঁজিয়া পায় নাই। পোস্টারে, চিকায় ঢাকিয়া গিয়াছে সব। আর আপনার কাছে গ্যালে সবাই কেমন যেন পরিবর্তন হইয়া যায়। ঐ যে বলিলাম ভাবসাবই বদলাইয়া যায়। অথচ সবাই কিন্তু আমার কাছ হইতেই গিয়াছে। আদিবাসী আর কয়জন। অথচ দেখেন যখন ঈদ বা কোনো উৎসব আসে তখন সবাই সত্যিকার মায়ামমতা স্নেহ-ভালোবাসা খুঁজিতে আমাদের কাছেই ছুটিয়া আসে। মাঝে মাঝে ভাবি তাহা হইলে দোষটা

কার? আপনার, নাকি আপনার বুকে যারা বসবাস করে তাদের। এই উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়াই পত্র লিখিলাম। বেয়াদবি হইলে মাফ করিয়া দিবেন।

ইতি

আপনার হতভাগ্য ছোট ভাই

অচিন গ্রাম।

তাং-২৫ শে ফাল্গুন, ১৪০০ সাল

পত্র-দুই

সালাম জানিবেন। বেশ কিছুদিন আগে আপনাকে একখানা পত্র দিয়াছিলাম। অবশ্য উত্তরের প্রত্যাশা করি না। কারণ আপনি যে ব্যস্ত। সময় কোথায়। তবুও যদি ধৈর্য ধরিয়া আমার পত্রগুলি নিয়মিত পড়েন তাহা হইলে বাধিত হইব। আশা করি কুশলেই আছেন। না-কুশলে আছেন কি করিয়া বলি? এই দূরে বসিয়া আপনার যে সব খবর সবর শুনিতে পাইতেছি তাহাতে কেউ কুশলে থাকিতে পারে? কি করিবেন—আপনার নামটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, কামটাও তো তেমন। পুরা দেশই আপনার দিকে তাকাইয়া আছে। যাত্রাগানের কথা মনে পড়ে? আমাদের বুকে বেশি হয়। আপনার ঐখানে তো বিভিন্ন থিয়েটার, আঁতেলবাজি, বায়োস্কোপ, ভেন্ড শো (ব্যান্ড শো) ইত্যাদির ভিড়ে এই সব যাত্রা, জারি, সারি হারাইয়া গিয়াছে। তবে আপনার মনে থাকার কথা। কারণ আঁতেলবাজরাই নিজেদের স্বার্থে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলিয়া ধরিতে গিয়া লোক 'দেখানো হইলেও এইসব করে। যাত্রাগানের মঞ্চটি মাঝখানে থাকে। আর চারিদিকে থাকে দর্শক। পাত্রপাত্রীরা চিৎকার করিয়া সংলাপ বলিয়া থাকেন। যাহার ফলে তাহাদের অভিনয়েরও একটি ভিন্ন ধারা রহিয়াছে। আপনিও হইলেন ঐরকম যাত্রাগানের মঞ্চ চারিদিকে দর্শক ভরপুর। হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে আপনার দিকে। তবে অধিকাংশ দর্শকই হইলাম আমরা, যারা একটু নিরীহ।

আপনার বুকে বসিয়া কেহ চেঁচাইতেছে, কেহ হাঁপাইতেছে, কেউ লাফাইতেছে কেউ বা জাতীয় স্বার্থে (!) বড় বড় বুলি আওড়াইতেছে। তবে ইহা একটি শুভ লক্ষণ, যে যাহা বলেন সবই নাকি জাতীয় স্বার্থে কিংবা জাতীয় অগ্রগতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে। কিন্তু তামাশার ব্যাপার হইল এই যে, ইহারা কেহই কিন্তু জাতীয় অগ্রগতিতে তেমন ভূমিকা রাখিতেছেন না—যতোটা রাখিয়াছেন স্বীয় অগ্রগতিতে। মাশাল্লা গাড়ি, বাড়ি, নারীতে ইহারা স্বয়সম্পূর্ণ। তাহা ছাড়া বিভিন্ন কারবার লইয়া এক একজন ভালো কারবারিও হইয়া গিয়াছেন। সবই তাহার ইচ্ছা। সুখ বোধহয় তাহাদের জন্যই আসিয়াছে। ঈশ্বর তাহাদের 'ছাপ্পড় ফাঁড়িয়া' দিয়াছেন। তবে রক্ষা

একখানা ছাপও মারিয়া দিয়াছেন। যে ছাপ দেখা না গেলেও কথা শুনিলেই বোঝা যায় এবং ইহাদের সহজেই চেনা যায়। যাহা হউক কী লিখিতে বসিলাম আর কি লিখিলাম। চিন্তা করিয়াছি এক লিখিলাম আর এক। ইদানীং আমার যে কী হইয়াছে বুঝি না, একটা বলিতে গেলে উহার সহিত অনেক কথা চলিয়া আসে। মনে হয় বগি এখনই লাইনচ্যুত হইবে। ঈদের আগেও কিন্তু এমন ছিল না। ঈদের পরে এই অবস্থা দেখা দিয়াছে। এই ব্যাপারে আমাদের পূর্বপাড়ার হাকিম আলী হেকিমের সহিত কথা বলিলাম। তিনি সোজা বলিলেন, ইহার জন্য কোনো দাওয়াই দরকার হইবে না, আস্তে আস্তে ঠিক হইয়া যাইবে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হেকিম সাহেব যাহা বলিলেন তাহার সারমর্ম হইতেছে—সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।

এই ঈদের সিজনে আপনার বুক খালি করিয়া যাহারা আমাদের বুকে আসিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন মিশিবার ফলে কথাবার্তার ষ্টাইলে কিছুটা পরিবর্তন হইয়াছে। লাইন ছাড়িয়া বেলাইনে ছুটে। কারণ আপনার ঐখানে তাহারা বক্তৃতা, বক্তব্য প্রদান সহ বিভিন্ন, ধান্দায় আন্ধা হইয়া এক এক সময় এক এক রকম কথা বলে। কেহ কেহ আবার নিজের এলাকার লোকের সহিতও বুদ্ধিজীবীর মতো কথা বলিয়াছে। কেহ কেহ পৃথিবীর বড়ো বড়ো মনীষীদের কোটেশানও ঝাড়িয়াছে। কেহ কেহ অন্যের কোটেশান নিজের বলিয়াও চালাইয়া দিয়াছে। আমার বুকের সহজ সরল মানুষ হা করিয়া শুনিয়াছে আর ভাবিয়াছে—আহারে উনি কি শিক্ষিত? অতএব বুঝিতে পারিতেছেন, আপনার বুকে যারা বসত করিতেছে তাহাদের অনেকেই ভণ্ড। নিজের আখের গোছাইতে ব্যস্ত। আমাদের কথা চিন্তা করিবার সময় নাই। আমাদের বুক হইতে একদম 'ফ্রেস্' অবস্থায় যাহারা গিয়াছিল, এক বছরের মাথায় এই ঈদের সময় দেখিলাম তাহাদের কথাবার্তা এমন কি হাঁটার স্টাইল পর্যন্ত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক এসব বলিয়া লাভ নাই। আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন হইবে কিনা জানি না। মুখের পরিবর্তনের তো প্রশ্নই উঠে না। বর্তমানে আমরা আপনার কাছ হইতে যারা দূর দূরান্তে আছি, ভালোই আছি। বুকটা হালকা হইয়া গিয়াছে। কারণ ঈদের ছুটির পর সবাই আবার আপনার কাছে ছুটিয়া গিয়াছে। জানি এখন আবার আপনার বুকটা ভারি হইয়া উঠিয়াছে। আবার অফিস আদালত বসিয়াছে। চলিবে ঘুষ খেলা, রাস্তাঘাটে 'জ্যাম', আন্দোলন, মিটিং, মিছিল, নীরব হইতে সরব, এরপর রবরবা হইবে কিন্তু জাতির কী হইবে? কারো পকেট ভরিবে কারো পকেট খালি হইবে। আসলে আপনার হইয়াছে যত জ্বালা।

ভাইজান আপনার জন্য "ফেল" (ফীল্) করি। ইংরাজিতে বলিলাম বলিয়া রাগ করিবেন না। এইবার ঈদে যাহারা আপনার কাছ হইতে আমাদের এখানে

আসিয়াছিল তাহাদের কাছে এই শব্দটি শিখিয়াছি। তাহারা প্রায়শই আমার বাসিন্দাদের উদ্দেশে এই কথাটি বলিত—আপনাদের জন্য আমরা 'ফেল' করি। আমাদের যথেষ্ট 'ফেলিংস' আছে। ইহার অর্থ নাকি দরদ জাতীয় কিছু। তাহাদের 'ফেলে'র মধ্যে দরদ আছে কিনা জানি না। তবে আমার 'ফেলে' দরদ আছে। কারণ আপনার জন্য আমাদের কষ্ট হয়—মায়া হয়, আপনি তো পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ রাজধানী হইতে পারিতেন। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, সৌন্দর্যে আপনাকে পরিপূর্ণ করা যাইত। আপনার তো কোনো কিছুরই কমতি নাই। কিসের অভাব? শুধু মানুষের অভাব, মনের অভাব। মানসিকতার অভাব, আমাদের কাজ যেন ধ্বংস করা। আজ যাহা অনেক কষ্টে গড়িলাম, কাল তাহা স্বার্থের বিরুদ্ধে হইলেই ভাঙ্গিব। সব আমলের চেহারাই এই ক্ষেত্রে একরকম। এই পলিটিক্স জিনিসটা আমার একদম অপছন্দ। ভাইজান—এই পদের ভাষণ আর কতো শুনা যায়? বক্তা হা করিলেই বুঝি উনি কী বলিবেন? সব কথার শেষ কথা সবাই পজিশন চায়। পজিশনে গেলে উন্নতির কথা বলেন। আর অপজিশনে থাকলে হরতালের ডাক দেন। এই পজিশন আর অপজিশনের ঠেলায় নাভিশ্বাস হয় আপনার আর আমাদের। আসল উন্নতির চেহারা তখন আর দেখা যায় না।

পূর্বের পত্রে লিখিয়াছিলাম আমাদের বুকে যারা থাকেন, তারা ভোট দেন, নেতা বানান তারপর আর নেতাদের চেহারাই দেখা যায় না। এই মাগুরার কথা ধরেন। "৯৪ এর উপনির্বাচনের সময় আপনার বুক থেকে পশিজন-অপজিশনের কতো নেতাই না সেইখানে গিয়াছেন। ভাবখানা কন্যা দায়গ্রস্ত পিতা সবাই। মেয়ের বিবাহ দিতে গিয়াছেন। বিবাহ শেষ এলাকায় কেহ নাই। আবার আর এক ভোট আসা পর্যন্ত কাহাকেও দেখা যাইবে কিনা সন্দেহ। ইহার চাইতে বাস্তব কৌতুককর ঘটনা আর কী হইতে পারে। সামান্য একটা উপনির্বাচন লইয়া মাগুরায় কী কাণ্ডটাই না ঘটিল। এসব নির্বাচন জাতীয় ঝামেলার পাশাপাশি কিছু ঘটনা আছে যাহা সবাইকে হতবাক করিয়া দেয়। দেশে দেশে যুদ্ধ হয় শুনিয়াছি কিন্তু সামান্য একটি বাস টার্মিনাল দখল লইয়া আপনার বুকে যে যুদ্ধ হইল সেই যুদ্ধে অহেতুক দু'টি জীবন নষ্ট হইল। '৯৪ এর মার্চ মাসের ২৯ তারিখ কালু মিঞার চায়ের দোকানে কদম আলী বেপারির লজিং মাস্টার আফাজ মিঞা পত্রিকা পড়িয়া শুনাইতেছিল। সায়েদাবাদে পরিবহন শ্রমিকদের বন্দুকযুদ্ধে দুইজন নিহত। জানি এইসবের জন্য আপনি দায়ী নন। এইখানেও রহিয়াছে রাজনীতি। মাঝে মাঝে ভাবি আমাদের রাজনীতিটা এতো নিষ্ঠুর কেন? রাজনীতি মানেই যেন ঝুঁকি লওয়া। আর তাহা হইতেছে জীবনের ঝুঁকি। বিদেশে রাজনৈতিক মিছিলগুলি দেখিলে আনন্দ হয়। কত সুন্দর। সুশৃঙ্খলভাবে সবাই প্রতিবাদ জানাইতে থাকে। ঐখানে বোমা বা

ককটেল ফুটিবার ভয় নাই। কোনো সন্ত্রাসীর আচমকা রিভলবার বা কাটা রাইফেল গর্জিয়া উঠিবার ভয়ও নাই। রহিয়াছে নিশ্চিত নিরাপত্তা। রহিয়াছে নিরাপত্তার সহিত মত প্রকাশের স্বাধীনতা। মনে প্রশ্ন জাগে—উহারাও মানুষ, আমরাও মানুষ। তাহারা পারিলে আমরা কেন পারিব না। আমরা তো আবার নিজেদের খু-উ-ব শিক্ষিত মনে করি। অন্তত এইসব বিষয়ে যাহারা নেতৃত্ব দিয়া থাকেন তাহারা। ইহা কী পদের শিক্ষা তাহাই বুঝি না। মাঝে মাঝে ভাবি আসলে আমাদের কি ভাবনার খেই হারাইয়া গিয়াছে? সে দিনের অপেক্ষায় আছি—যেদিন এইদেশে সুস্থ রাজনীতি হইবে। বক্তারা যাহা বলিবে তাহা সত্য ভাবিতে পারিবো। জীবনের ঝুঁকি লইয়া রাজনীতি করিতে হইবে না।

যাহা হউক আজ আর লিখিব না। আকাশ কালো মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে, ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। এক্ষুণি মুষলধারে বৃষ্টি নামিবে। ভীষণ কষ্ট লাগিতেছে। রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত হইয়া যাইবে। বাড়ির উঠানেও কাদা হইবে। ইহার মধ্যেই সবাইকে কাজ করিতে হইবে। কারণ আপনার মত আমার বুকে রাস্তাঘাট সব পাকা নয়। ভোটের সময় সবাই প্রতিশ্রুতি দিয়া যায়—'আমি নির্বাচিত হইলে রাস্তাগুলি পাকা করিয়া দিব। কারণ আপনাদের দুঃখ আমার সহ্য হয় না।' এইসব প্রতিশ্রুতি শুধুই শ্রুতি। আমাদের এইসব কথা সহ্য হইয়া গিয়াছে। সবাই বোঝে সে মিথ্যা বলিতেছে। তাহার পরও ভোট দেয়। না দিয়াও বা লাভ কী। নিজের ভোটাধিকার কেইবা হারাইতে চায়। কারণ ভোট না দিলেও কেহ না কেহ উহা দিয়া দিবেই। বৃষ্টি আসিয়া গিয়াছে। আজ আর নয়। আগামীতে আবার লিখিব। কী লিখিতে কী লিখিয়াছি নিজেও বুঝি না। ভুল হইলে ছোট ভাই হিসাবে ক্ষমা করিবেন।

ইতি
আপনার স্নেহের
অচিন গ্রাম
তাং ২১শে চৈত্র ১৪০০ সাল

পত্র-তিন

একটি চুটকি দিয়া শুরু করিতেছি। চুটকি শুনিয়া মুচকি হাসিবেন না। চুটকিটি বলিতে একটু লজ্জাও লাগিতেছে। কারণ চুটকি বা হাসির কথা বলিলে আপনার ঐখানে কিছু কিছু আঁতেলের আবার একটু খাটো করিয়া দেখিবার প্রবণতা রহিয়াছে। অথচ তাহারা নিজেরাই যে হাসির পাত্র হইয়া রহিয়াছে, তাহা তাহাদের কে বুঝাইবে। বিদেশে নাকি অসাধারণ ব্যক্তিরাও সাধারণ কথায় হাসে

আর এইখানে অসাধারণ ব্যক্তিরা সাধারণ কথা তো দূরে থাক হাসির কথায়ও হাসেন না। একদম যে হাসেন না তাহাওবা বলি কী করিয়া। হাসেন তবে চোরা হাসি দেন। পাছে কেউ দেখিয়া ফেলে। কারণ হাসিতে দেখিলে তাহাদের বুদ্ধি দাঁতের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে। এই কথাগুলি এইজন্য বলিলাম—কিছুদিন আগে আপনার বুক হইতে প্রকাশিত একটি জাতীয় সাপ্তাহিকে ঈদের অনুষ্ঠানমালার সমালোচনা বাহির হইয়াছে। উত্তরপাড়ার লজিং মাস্টার আফাজ মিয়া তাহা পড়িয়া শুনাইতেছিল। ঐ সমালোচনায় সমালোচক লিখিয়াছেন, মানুষ হালকা পাতলা হইলে তাহার নিকট হইতে দর্শক পাতলা অনুষ্ঠান আশা করে। গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠান নহে। এই বাক্য পড়িয়া আফাজ মিঞার সঙ্গে সবাই একসঙ্গে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাদের হাসির কারণ হইল শরীরের সঙ্গে বিষয়ের সম্পর্ক কী? তাহা কেহ বুঝিতে পারিতেছিল না। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি ঐসব কথা লিখিয়াছেন তিনি নাকি বয়োবৃদ্ধ এবং বয়সের ভারে 'নেতিয়ে' পড়িয়াছেন। আফাজ মিঞা শেষে যোগ করিল, "আগামীতে ঈদে এই বৃদ্ধ ব্যক্তিকেই অনুষ্ঠান করিতে দিলে হয় তাহা হইলে আমরা 'নেতানো' এবং 'বৃদ্ধ' জিনিস দেখিতে পাইবো। উহা নির্মল অনুষ্ঠানও হইতে পারে! যাহা হউক ইহাদের লইয়া সময় নষ্ট করা সমীচীন নহে। কারণ ইহাদের বয়সই বাড়িয়াছে অন্য কিছু বাড়ে নাই। কাজের কথায় আসি।

ভাই চুটকিটা হইলো, উড়োজাহাজের প্রথম দিকের ঘটনা। এক বৈমানিক তাহার একটি ছোট্ট বিমানে পয়সার বিনিময়ে লোক চড়াইতেন। একদিন এক বৃদ্ধ পাঠানের সহিত তাহার তর্ক বাঁধিয়া যায়। বৃদ্ধের দাবি—তাহার স্ত্রীকেও তাহার সঙ্গে প্লেনে উঠাইতে হইবে। কিন্তু সেইজন্য সে আলাদা কোন পয়সা দিবে না। 'ঠিক আছে', শেষ পর্যন্ত পাইলট রাজি হইল, একজনের ভাড়ায় দুইজনকেই নিব কিন্তু এক শর্তে —উড়িবার সময় কেহ একটি কথাও বলিতে পারিবে না।

'টু শব্দ করিলেই দুজনকে ভাড়া দিতে হইবে।'

রাজি হইয়া বুড়া-বুড়ি প্লেইনে উঠিলেন। আকাশে উঠিয়া ডাইনে-বাঁয়ে কাত হইয়া খাড়া নিচের দিকে গোত্তা খাইয়া, নানানভাবে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিল পাইলট। কিন্তু পিছনের সীট হইতে সামান্যতম শব্দও করিল না কেউ। শেষে হার মানিয়া প্লেইন লইয়া পাইলট নিচে নামিয়া আসিল। বুড়া পাঠান প্লেন হইতে নামিতেই পাইলট তাহাকে প্রশংসা করিয়া বলিল,

'সত্যিই সাহসী লোক আপনি আকাশে উঠিয়া ঐ রকম ডিগবাজি খাইতে গিয়া এক-আধবার আমি নিজেও ভয় পাইয়াছি, অথচ আপনারা টু-শব্দটাও করিলেন না!'

বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিলেন, 'ধন্যবাদ, তবে স্বীকার করিতে দ্বিধা নাই, একটা সময়ে আমি কথা বলিয়া উঠিয়াছিলাম প্রায়।

—কখন? কোন সময়ে? জিজ্ঞাসা করিলেন পাইলট।

—ঐ, যখন ছিটকাইয়া বাহিরে চলিয়া গেল আমার স্ত্রী, ঠিক তখন।

এই কৌতুক শুনিয়া আপনার হাসি আসিয়াছে কি না জানি না তবে হাসাইবার জন্য আমি ইহা বলি নাই। আমাদের দুঃখ তুলিয়া ধরিতেই উদাহরণ হিসাবে বলিলাম। কারণ সামান্য কিছু পাওয়ার আশায় অনেক বড়ো ক্ষতি হইয়া গেলেও আমরা চুপ করিয়া থাকি। ১৪০০ সালটা এভাবেই গিয়াছে, জানি না ১৪০১ সালে কী হইবে? নতুন বছর—নতুন শতাব্দী। গতবার এই 'শতাব্দী শব্দখান লইয়া কি যে ঝামেলা করিল আপনার বাসিন্দারা। তবে সবাই না। কেহ নতুন শতাব্দীকে বরণ করিয়া অনুষ্ঠান করিল। কেহ করিতে যাইয়া থামিয়া গেল। জানি না এইবার কী হইবে। যাউক ঐসব নিয়া আমাদের মাথাব্যথা নাই। আমাদের চিন্তা একটাই, গত বছর কী পাইয়াছি আর এ-বছরটায় কী পাইব। গত বছরে কী কী জিনিস কমিয়াছে। এই বছরে ঐসবের অবস্থা কী হইবে। আমি বহুত হিসাব করিয়া একখানা জিনিস বাহির করিয়াছি। তাহা হইল গত বছরে আমরা ১৪০০ সালটা হারাইয়াছি আর এই বছরে ১৪০১ সালটা পাইয়াছি। তবে গত বছর অনেক কিছুর হার বাড়িয়া গিয়াছে আবার অনেক কিছুর হার কমিয়া গিয়াছে। যেমন—

১। ট্রাকের সাহস বাড়িয়াছে—পাশাপাশি মানুষের আয়ু কমিয়াছে।

২। পাশের হার বাড়িয়াছে—শিক্ষিতের হার কমিয়াছে।

৩। মানুষের সংখ্যা বাড়িয়াছে-জায়গার পরিমাণ কমিয়াছে।

৪। বাসের যাত্রী বাড়িয়াছে-ট্রেনের যাত্রী কমিয়াছে।

৫। গানের শিল্পী বাড়িয়াছে-গানের মান কমিয়াছে।

৬। সন্ত্রাস বাড়িয়াছে-নিরাপত্তা কমিয়াছে।

৭। ডিসের সংখ্যা বাড়িয়াছে-ভিসিআরের সংখ্যা কমিয়াছে।

৮। বুদ্ধিজীবী বাড়িয়াছে-বুদ্ধি কমিয়াছে।

৯। বক্তার সংখ্যা বাড়িয়াছে—বক্তব্যের গুরুত্ব কমিয়াছে।

১০। প্রার্থী বাড়িয়াছে-পদ কমিয়াছে।

এই ভাবে পুরা কাগজ জুড়িয়াই লিস্টি লেখা যাইবে। এইসবের জন্য কাহারা দায়ী তাহা আপনি জানেন। কিন্তু কিছুই করিতে পারিতেছেন না। মাঝখানে দুর্নাম হইতেছে আপনার। তাই আপনার জন্য আমার কষ্ট হয়। আপনার বুকে বসিয়া শুধু সবাই কথাই বলিয়া গেল। যে কথার সহিত তাহাদের কাজের কোন মিল নাই। অথচ কাজ এমন একটি জিনিস যাহা মৃত্যুকে অমর করিয়া রাখে। দোয়া

করি এই নতুন শতাব্দীতে সবাই কথা দিয়া নয়, কাজ দিয়া আপনার উন্নতি ও আমাদের উন্নতিতে আগাইয়া আসিবে। আজ এ পর্যন্তই।

ইতি

অচিন গ্রাম

তাং ২৮ শে চৈত্র, ১৪০০ সাল।

পত্র-চার

সালাম জানিবেন। চারিদিকে ভ্যাপসা গরম। যে হারে গরম পড়িয়াছে তাহাতে জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। তবে এই গরমের জ্বালা আপনার বুকের অনেক বাসিন্দার বুকে জ্বালা ধরাইতে পারে নাই। কারণ রাস্তায় বাহির হইলে গাড়িতে এবং তাহাদের বাড়িতে শরীর হাত-পাও ঠাণ্ডা করিবার যন্ত্র লাগানো থাকে। যত কষ্ট গরিব এবং আমার বুকের বাসিন্দাদের। এইভাবে আর কিছুদিন গরম পড়িলে ভবিষ্যৎ ঝরঝরা। প্রতিবছর পহেলা বৈশাখের আগে পরে কিংবা ঐদিন আকাশ কিছুটা কালো থাকিত। আসমান গর্জন করিত। জোরে বাতাস বহিত—একটু একটু বৃষ্টিও হইত। এইবার কিছুই হইল না। বরং উত্তাপ বাড়িল। মনে হয় প্রকৃতি আমাদের সবার সঙ্গে চরম গোস্‌সা করিয়াছে। আর করিবেই বা না কেন? পহেলা বৈশাখটাকে নিয়া কী সব তামাশা যে করিলেন—যাহা দেখিয়া আমার বাসিন্দাদের হাসিয়া লুটোপুটি হইবার দশা হইয়াছে। আপনার বাসিন্দারা যেমন ঠাণ্ডাযন্ত্র লাগানো গাড়িতে বসিয়া আমারে বুক হইতে কেহ আপনার কাছে গ্যালে টিপ্পনী সুলভ 'ব্যাঙ্গ হাসি' দেয়। আমার বাসিন্দারাও এবার তেমনি হাসিয়াছে। আমার জাতভাই হিজলপুরের সোনা মিঞা গত পহেলা বৈশাখ আপনার ঐখানে গিয়াছিল। আবার বিকালেই চলিয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার সময় আমাদের উত্তরপাড়ার গেদুমুন্সির চায়ের দোকানে বসিয়া গল্প করিতেছিল। বলা বাহুল্য সোনা মিঞা আবার বেশ ভালো বলে। সোনা মিঞার চারিদিকে সবাই ঘিরিয়া বসিয়াছিল। সোনা মিঞার কথা শুনিয়া সবাই হো ঃ হোঃ হোয়ঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। কেউ কেউ আপনার বাসিন্দাদের উপর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সোনা মিঞা যাহা বলিয়াছে তাহার সারমর্ম হইল, 'ঐদিন আপনার বুকের কিছু নামকরা জায়গায় (যাহা এই ধরনের কাজে ব্যবহৃত হয়) যেমন বিভিন্ন বটমূল, বটগাছের নীচে এবং কিছু ব্যক্তির বাড়ির উঠানে নাকি পাল্লা দিয়া পান্তাভাত খাইয়াছে সবাই। তাহাও আবার পেঁয়াজ ও শুকনা মরিচ পোড়াইয়া। এইভাবে নাকি বৈশাখ বরণ করিয়াছে। সুন্দর সুন্দর কাপড় পড়িয়া বাটার, ব্রেড, আর ডিমের 'পোজ'

বাদ দিয়া ঐদিন নাকি দলে দলে স্বামী, স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা বাগানের যাবতীয় ফুল খোপায় চড়াইয়া দুলিতে দুলিতে বটগাছের নিচে বসিয়া পান্তাভাত খাইয়া বৈশাখ উৎসব পালন করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া পাইকপাড়ার রহম আলী ভীষণ ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিল,

'ব্যাটারা ফাইজলামির আর জায়গা পায় নাই'—এই বলিয়া সে সোনা মিঞাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল। সবাই মিলিয়া করম আলীকে ঠেকাইল।

সোনা মিঞার দোষ কী?

সে কেন ঐখানে গেল? করম আলীর রাগ সেইখানেই।

ভাইজান, মনে কিছু লইবেন না। সোনা মিঞা আর করম আলীর মত আপনারও রাগ হয় বুঝি। কারণ এই জাতীয় ব্যক্তিরা আপনার ইমেজ ক্ষুণ্ন করিতেছে। আমার বুকের বাসিন্দাদের প্রায় নিত্যদিনের খাবারই হইতেছে এই পান্তাভাত। আর সারাবছর ইংরেজি মাসের হিসাব করিয়া নববর্ষ আসিলে আপনার বুকের বাসিন্দারা 'পান্তাভাত' লইয়া এই ধরনের ইয়ার্কি করিলে কিছুটা তো রাগ হইবেই। আমরা আর কতদিন এইভাবে লোক দেখানো বাঙালি হইয়া থাকিব বলিতে পারেন? আমাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে শুধুমাত্র একটি দিনেই স্মরণ করিব? গোবিন্দ চন্দ্র দাস এই কারণেই হয়তো লিখিয়াছেন,

বাঙালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?
এমন অধম জাতি
বুকে মার শত লাথি,
মুখে মার শত ঝাঁটা, অনায়াসে সয়।

এই কথাগুলি শুনিতে খুব খারাপ লাগিলেও আপনার বুকের কিছু কিছু ব্যক্তির জন্য ইহা প্রযোজ্য। নইলে কবিও বা এই সব কথা লিখিবেন কেন? সারাদিন নববর্ষ করিয়া বাসায় গিয়া আপনার বুকের এই সব বাসিন্দা আবার 'জিটিভি', 'এমটিভি' এমন কি 'পি টিভি'র চ্যানেল টিপাটিপি করিতে থাকেন। বাড়ির ছাদে ছাদে আইজকাইল নাকি বড় বড় ছাঁকনির মত দেখা যায়। কদম আলী বেপারী লজিং মাস্টার আফাজ মিয়া বলিয়াছেন, এইগুলোকে নাকি, 'ডেশ' (ডিশ্) বলে। ভাত খাওয়ার ডিশে ভাত খাইয়া পেট ভরে। কিন্তু এই ডিশের নর্তন-কুদন দেখিয়া কাহারো কাহারো মন ভরিলেও আমাদের সংস্কৃতি নাকি চাঙ্গে উঠিতেছে। আর তাহা ছাড়া বিটিভির অনুষ্ঠানের যে 'ছিরি দাঁড়াইয়াছে উহাও নাকি এখন অনেকে দেখিতেছেন না। যাহার ফলে ভবিষ্যতে আমাদের সংস্কৃতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা ভাবিলেও 'গা' শিহরিয়া উঠে। এই অবস্থা চলিতে

থাকিলে আজ যেই শিশুর জন্ম হইয়াছে সে ভবিষ্যতে এই নববর্ষ পালন করিতে গিয়া যদি হিন্দিতে বক্তব্য রাখে তাহা হইলে আশ্চর্য হইবার কিছু থাকিবে না। উন্নয়নশীল দেশেও এইসব 'ডিশ' আছে। কিন্তু তাহারা নিজেদের 'কালচার' ঠিক রাখিয়া তাহাদের যেইটুকু শিক্ষণীয় সেইটুকুই গ্রহণ করিয়া থাকে। আর আপনার বুকের বাসিন্দারা পারতপক্ষে নিজেদেরটা বিসর্জন দিয়া অন্যেরটা গ্রহণ করিতে পারিলেই যেন নিজেদের বেশি 'স্মার্ট' মনে করে। এই প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উক্তি মনে পড়িয়া গেল, কবিগুরু বলিয়াছেন, 'বাঙ্গালী চিরদিন দালালী করিতেই পারে। কিন্তু দল গড়ে তুলতে পারে না।' সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমাদের এই মানসিকতার জন্য, স্বভাবের জন্য অনেক কিছু থাকিতেও আমরা অনেক ক্ষেত্রেই পিছাইয়া রহিয়াছি। আমি আপনার বাসিন্দা বা এই প্রজন্মের কাহারো জন্য তেমন চিন্তিত নই। আমার চিন্তা হইল শিশুদের জন্য যাহারা আগামীতে এই জাতির হাল ধরিবে। এই তিন-চারদিন আগে-একটি ঘটনা দেখিয়া আমার ভীষণ কষ্ট হইয়াছে। আমাদের করিম মাতবর আপনার বুকে বসতবাড়ি করিয়া পরিবার রাখিয়াছে। এই বৈশাখের ছুটিতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। তাহার ছোট ছেলে 'পাবন' বাবার সহিত বানরীপাড়ার হেকমতের বাড়িতে গিয়াছিল। হেকমত ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,

: তোমার নাম কী? উত্তরে ছেলেটি বলিয়াছিল, মেরা নাম হ্যায় পাবন।

: বাড়ি?

: ক্যা-পুছতা?

: বাড়ি কোথায়?

: ও মোকাম? ঢাকায়।

অবস্থাটা বুঝিয়াছেন?

জিটিভি ভাইরাসে ইহারা ভাষাই ভুলিতে বসিয়াছে। আর আপনার বুকের বাসিন্দারা 'পান্তা ভাত' খাইয়া নববর্ষ পালন করিতেছেন। সুতরাং ভাইজান এখনও সময় আছে। যাহারা যাইবার তাহারাতো গোল্লায় গিয়াছেই। আর ফিরানো যাইবে না। অনেকটা টুথপেস্টের মত। ডিব্বা হইতে একবার বাহির করিলে শত চেষ্টায়ও আর যেমন ঢুকানো যায় না। ইহাদের মাথায়ও তেমনি কিছু ঢুকাইতে পারিবেন না। তবে যে শিশুরা আগামী দিনে আমাদের উত্তরসূরি হইবে, এই দেশের হাল ধরিবে তাহাদের এই করাল গ্রাস হইতে বাঁচান। নইলে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়া যাইবে। তাই অনুরোধ 'আপনার শিশুকে টিকা দিন'-এর পাশাপাশি

'আপনার শিশুকে সঠিক শিক্ষা দিন।' নইলে সামনে ভয়াবহ অবস্থা আসিতেছে। আজ এই পর্যন্তই। অধমের কথায় কষ্ট নিবেন না। আমরা তো আপনার বাসিন্দাদের কাছে চিরকালই "ক্ষ্যাত"। সেই হিসাবে হইলেও ক্ষমা করিবেন।

ইতি

আপনার স্নেহধন্য

অচিন গ্রাম

তাং ৫ই বৈশাখ, ১৪০১

পত্র-পাঁচ

সালাম জানিবেন।

প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখিয়া বিরক্ত করিতেছি বলিয়া রাগ করিবেন না। জানি কিছুটা বিরক্ত হইতেছেন। কী আর করা ভাইজান আমাদের স্বভাবটাই এই, এক জিনিস বেশিদিন চলিলে, শুনিলে কিম্বা কেহ বলিলে বিরক্ত হইয়া যাই। আবার কিছু কিছু বিষয় রহিয়াছে যাহার কারণে পুরা জাতিই বিরক্ত হয় অথচ তাহার কোন প্রতিকার হয় না। ইহা যেন নিয়মিত অনিয়ম হইয়া রহিয়াছে। যেমন ঘুষ খাওয়া, দুর্ঘটনা ঘটা, কথায় কথায় নিজের মনে করিয়া অন্যের গাড়ি ভাঙা, নেতাদের টেপরেকর্ড মার্কা বক্তৃতা ইত্যাদি। তবে আমি নিশ্চিত, আপনি বিরক্ত হইবেন না। কারণ আপনি নিজেও জানেন আপনার ইমেজ নষ্ট হওয়ার জন্য আপনি দায়ী নন। সুতরাং এইসব কথা আপনার গায়ে লাগিবে না।

যাউক প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি। গত ১৮ এপ্রিল '৯৪ তারিখে আপনার বুক হইতে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় একটি খবর পড়িয়া খুব হাসি পাইয়াছে। পাশাপাশি দুঃখও লাগিয়াছে। খবরের শিরোনামটি ছিল 'পাঁচতলা ভবনটি হঠাৎ হেলে পড়ল।' ভিতরে লিখিয়াছে, 'গতকাল রোববার রাজধানীর শান্তিনগর মোড় থেকে রাজারবাগ অভিমুখী সড়কের পাশে একটি হোটেল ও রেস্তোরাঁর পাঁচতলা ভবনটি খুব ভোরে হঠাৎ হেলে পড়ল।' আর এক দৈনিকে লিখিয়াছে, 'গতকাল রোববার সকাল হইতে ভবনটি ধীর গতিতে পেছনের দিকে হেলিয়া যাইতে থাকে।' ভবনের অবস্থা শুনিয়া মনে হইতেছে খুব ভোরে 'মর্নিং ওয়াক' করিতে গিয়া আড়মোড়া ভাঙিয়া পিছনের দিকে হেলিয়াছে মাত্র। কিংবা ইজিচেয়ারে বসিয়া শরীরটাকে একটু হেলাইয়া দিয়া ইজি হইয়া বসিয়াছে। অন্যথায় হেলিবার কথা নয়। পড়িয়া যাইবার কথা। অবশ্য পিছনে আর একটি একতলা দালান যদি

ঠেলিয়া না ধরিত তাহা হইলে ভবনের প্রতিটি জয়েন্টই খুলিয়া পড়িত।

মজার ব্যাপার হইতেছে, ১৯৮৪ সালে নির্মিত এই ভবনটি নাকি দুর্বল ভিত্তির জন্য হেলিয়া পড়িয়াছে। গেদু মুন্সির চায়ের দোকানে লজিং মাস্টার আফাজ মিঞা কাগজ পড়িয়া শুনাইতেছিল। কাগজে আরো লেখা হইয়াছে, একজন প্রকৌশলী নাকি জানাইয়াছেন, নির্মাণের ত্রুটির কারণে বাড়িটির এই দশা হইয়াছে। খাড়া অবস্থায় ভবনের ত্রুটি ধরা না পড়িলেও হেলিয়া পড়ার পর ইহার ত্রুটি বাহির হইয়াছে। শত শত লোক এই ভবন দেখিতে ভিড় করিয়াছে। পুলিশকে নাকি লাঠিচার্জও করিতে হইয়াছে।

হায়রে পাবলিক! আপনার বুকে এতো কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়। তবুও মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি বাড়ে না। এই ভবনটি যদি কাইত হইয়া পড়ে তাহা হইলে অবস্থাটা কি হইবে তাহা কেউ চিন্তা করে না। যাহা হউক আমি হঠাৎ এই ভবন লইয়া কেন লিখিতেছি সেই প্রসঙ্গে আসি। ভাইজান, আপনার বাসিন্দাদের একটি স্বভাব হইতেছে, বিপদে না পড়িলে চোখ কান খোলে না। আমাদের উত্তরপাড়ার তালেব আলীর ভাষায় 'চোর গ্যালে বুদ্ধি বাড়ে।' কারণ আপনার বুকে কেহই যেন ভাবিয়া কাজ করে না। কাজ করিয়া ভাবে। তাহাও আবার সমস্যায় পড়িলে। এই ভবনের কথাই ধরেন। হেলিয়া পড়িবার পর বিভিন্ন প্রকৌশলী, কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন উক্ত ভবনটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। কিন্তু ভবনটি হেলিয়া না পড়িলে এই কথা ইহ জিন্দেগীতে জানা যাইতো না। শুধু তাহাই নয় কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া যেন সাপ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বৈশাখ মাসের বার তারিখের কাগজে দেখিলাম–রাজউক অননুমোদিত ও ঝুঁকিপূর্ণভাবে নির্মিত দালানকোঠা চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়াছে। এই জন্য নাকি বেশ কয়েকটি টিমও গঠন করা হইয়াছে। দেশ ও জাতির বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদ রক্ষা ও হেফাজতের স্বার্থে নাকি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে শান্তিনগরের ঐ ভবনটি হেলিয়া পড়িবার পূর্বে কেন এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইল না? সেই হিসাবে ভবনটিকে প্রশংসা করিতে হয়। কারণ উহার হেলানোর কারণে প্রশাসনের অনেকের বুদ্ধিই 'এলানো' হইতে 'খাড়া' হইয়াছে। তাহা হইলে আমাদের উত্তরপাড়ার তালেব আলীর কথাই ঠিক 'চোর গ্যালে বুদ্ধি বাড়ে।' এই ঘটনার পর হইতে পত্রিকাগুলিও সোচ্চার। এই ভবনকে কেন্দ্র করিয়া আরো অনেক ভবনের খবরই তাহারা ছাপিতেছেন যাহা অননুমোদিত।

ইতিমধ্যে মোহাম্মদপুরেও আর একটি বহুতল ফ্লাট বাড়ি হেলিয়াছে। আমরা জানি আপনার বুকে লোকসংখ্যা বাড়িবার কারণে ক্রমবর্ধমান আবাসিক সঙ্কটকে পুঁজি করিয়া একশ্রেণীর লোক ব্যবসায়ীক স্বার্থে বহুতল ভবন নির্মাণ করিতেছে। বহু

পূর্বে নির্মিত একতল বা দ্বিতল গাঁথুনির বাড়িসমূহ বহুতল ভবনে রূপান্তর করিতেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব নির্মাণ কাজে কোন রকম আইন-কানুন নিয়ম নীতি বা বৈধতার কোন তোয়াক্কাই করা হয় না। জমির দখল, নকশা, অনুমোদন করাইতে ঘাটে ঘাটে মোটা অংকের অর্থ বিলাইয়া দীর্ঘদন যাবৎ এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিলেও প্রতিকারের কোন উদ্যোগ নাই। সবাই যেন উদাসীন। তবে এই ধরনের বিপদে পড়িলে আবার টনক নড়িয়া উঠে। যেমন শান্তিনগর ও মোহাম্মদপুরের ঐ 'হেলানো' ভবন দুইটির কারণেই এইসব গোপন (গোপনও বা কি করিয়া বলি। সবাইতো জানেন এইসব চলিতেছে) খবর ফাঁস হইতেছে। তবে এইসব খবর এখন বেশ গরম হইলেও কিছুদিন পর আবার অদৃশ্য কারণে ঠাণ্ডাও হইয়া যাইবে। আবার যদি কোন ভবন 'এলাইয়া' বা 'হেলাইয়া' পড়ে তাহা হইলে গরম হইবে এরপর আবার ঠাণ্ডা হইবে। এইভাবে আপনার ওপর ঠাণ্ডা আর গরমের খেলা চলে যাহা জাতির জন্য শরমের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

আচ্ছা ভাইজান ভাবিয়া কাজ করিলে তো আর পরে ভাবিতে হয় না—এই কথা কি আপনার লোকজন বোঝেন না? ঐ যে শাঁখারীবাজারে গ্যাস সিলিণ্ডারের বিস্ফোরণে অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটিল তাহার পর ঐ জাতীয় বেলুন ব্যবসা বন্ধ করা হইল। কোথাও সন্ত্রাসী ঘটনায় প্রাণহানি ঘটিলে তাহার পর তদন্ত শুরু হইল, এই ভবন কাৎ হইল আর অনিয়ম খোঁজা শুরু হইল। কিন্তু এইগুলি যাহাতে আর হইতে না পারে সেই জন্য কি কোনো সিস্টেম গড়িয়া তোলা যায় না? সব তো 'আমরা আমরাই।' তাহা হইলে কেন এইসব হইবে? পরিশেষে মূর্খ হিসাবে (আগের পত্রেও লিখেছি আপনাদের ভাষায় আমরা ক্ষ্যাত) একটি বচন আপনাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া পত্র লেখা শেষ করিব। বচনটি বাল্যশিক্ষার ছেলেমেয়েরাও জানে—তবে আমি তাহাদের উদ্দেশ্যে বাক্যটি বলিবো না—আপনার বুকে যাহারা উচ্চশিক্ষিত বলিয়া দাবি করেন এবং নিয়ম নীতি বানান ও পরিচালনা করেন তাহাদের কাহারো কাহারো উদ্দেশ্যে বলিতে চাই—ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না', কারন এখনও সময় আছে। পরে কিন্তু শোধরাইবার উপায়ও থাকিবে না। বেয়াদবি মাফ করিবেন। আপনার শান্তি কামনা করিয়া শেষ করিতেছি।

ইতি

আপনার স্নেহের

অচিন গ্রাম

তাং-১২ই বৈশাখ, ১৪০১

পায়ের প্রতিভা

ইংল্যাণ্ডের একটি অঞ্চলে কিছু শ্রমিক মাটি খুঁড়তে গিয়ে হঠাৎ একটি মাথার খুলি পায়। আর এই খুলিতে লাথি দিয়ে খেলতে খেলতেই ফুটবলের জন্ম। জন্ম ফুটবল খেলার। মানুষের পায়েও যে প্রতিভা থাকতে পারে তার প্রমাণ ফুটবল খেলা। ফুটবলের মতো এতো জনপ্রিয় খেলা পৃথিবীতে আর নেই। আর নেই বলেই এই খেলাকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী এত উন্মাদনা।

ফুটবল খেলা নিয়ে মজার মজার গল্প রয়েছে আমাদের দেশে। একটি গ্রামে একবার এক অশিক্ষিত গ্রাম্য মোড়ল স্থানীয় তরুণদের আয়োজিত ফুটবল খেলায় অতিথি হয়েছিলেন। যথাসময়ে খেলা শুরু হয়ে গেছে। দুপক্ষই বার বার একে অন্যকে আক্রমণ করছিল। কিন্তু গোলকিপারের দক্ষতার কারণে কোনো পক্ষই গোল করতে পারছিল না। প্রতিবারই গোলকিপার গোলপোস্টে কেউ কিক করলেই প্রতিহত করে দিচ্ছে। এভাবে আধঘণ্টা খেলা চলার পর গ্রামের মোড়ল চিৎকার করে উঠলেন,

: তোমরা সবাই খেলা বন্ধ কর।

মোড়লের এই কথায় আয়োজকরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ব্যাপার কী? মোড়ল সাহেব হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন কেন? ফুটবল কমিটির সভাপতি বললেন,

: কী ব্যাপার মোড়ল সাহেব। খেলা বন্ধ করতে বলছেন কেন?

: তোমরা কি ফাইজলাম পাইছো? এই ছেলেগুলারে কখন থেইকা কষ্ট দিতাছো। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন মোড়ল।

সভাপতি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, ওরা তো খেলছে। মাত্র ৩০ মিনিট হল, আরো ৬০ মিনিট খেলবে, এখনই বন্ধ করা যাবে না। এটা নিয়ম।

: রাখো তোমাদের বস্তাপচা নিয়ম। আমি এই গ্রামের মোড়ল। আমার এলাকার ছেলেপেলেদের আমি জাইনা-শুইনা কষ্ট দিতে পারি না। সমস্ত নষ্টের গোড়া ঐ গোলপোষ্টের ছেড়া দুইটা।

: জ্বী। ওরা তো গোলকিপার। উদ্বিগ্ন হয়ে জবাব দিলেন সভাপতি।

: রাখো তোমার গোলকিপার। যতোবারই বল মারে ততোবারই ওরা হাত দিয়ে বলটা ধইরা ফালায়। এইটা ফাজলামি না? শোনেন। ঐ দুইজনরে গোল পোস্টের থাম্বার লগে দড়ি দিয়া বাইন্ধা রাখেন, তারপর ওদের বলেন যত খুশি গোল দিক। শিক্ষিত মানুষ হইয়া এই সামান্য জিনিসটা আপনাদের মাথায় আসল না। আবার নিয়মের দোহাই দেন। যান।

গল্প তো গল্পই। বাস্তব নয়। ফুটবল হচ্ছে একটি নিয়মের খেলা। নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয় এই খেলায়। আর সেই নিয়ম যাতে কেউ লংঘন করতে না পারে সে জন্য রয়েছে প্রতিটি খেলায় একজন করে রেফারি। তবে বিশ্বকাপ ফুটবলেও এই রেফারিদের নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। '৯৪ এর বিশ্বকাপেতো কয়েকজন রেফারির বিরুদ্ধে ফিফা শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় রাউন্ডের দুটি খেলায় বিতর্কিত রেফারিংয়ের জন্য মেক্সিকোর আর্তুয়ো ব্রিজিও কার্টারকে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও কয়েকজনকে জরিমানা করা হয়েছে। নাইজেরিয়ার খেলায় একই দিনে দুজন রেফারি সর্বমোট ১৭টি হলুদ কার্ড ও ৩টি লাল কার্ড দেখিয়েছেন। সম্ভবত বিশ্বকাপের ইতিহাসে এটাও একটি রেকর্ড। রেফারিদের শাস্তি দেয়া হলেও তাদের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে যে সব দল ভাল খেলেও হেরে যায় সে সব দলকে আবারো খেলার সুযোগ দেয়া কিংবা তাদের ব্যাপারে ফিফার নতুন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

রেফারির ভুলের মাসুল খেলোয়াড়রা কেন দেবেন? এবারকার রেফারিদের কথা বলতে গিয়ে ইতালির ফুটবল এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত রেফারিদের ওপর একটি শিক্ষামূলক বইয়ের কিছু উপদেশের কথা মনে পড়ে গেল। বইতে রেফারিদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে:

১। মাঠে বেশি বড়াই করবেন না। কারণ আপনি মাঠের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী।

২। আপনার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অতিরিক্ত কঠোরতা কিংবা অতিরিক্ত কোমলতা প্রকাশ করবেন না। কারণ এটা ফুটবল মাঠ—নাটকের মঞ্চ নয়।

৩। কোনো খেলোয়াড় আইন ভঙ্গ করলে আঙুল উঁচিয়ে তার দিকে তেড়ে যাবেন না। অথবা তার কাঁধ ধরে এমনভাবে ঝাঁকাবেন না যেন আপনি তাকে অ্যারেস্ট করতে চাইছেন। মনে রাখবেন, আপনি রেফারি—পুলিশের লোক নন।

কিন্তু দু'একটি বিশ্বকাপ খেলায় রেফারিদের দেখে মনে হয়েছে এর বোধহয় কেউ কেউ পুলিশে ছিলেন। সম্ভবত ঘুষও খান। নইলে অমন সিদ্ধান্ত কেন?

রেফারিং করা একটি সম্মানের কাজ, যাঁর সিদ্ধান্তের ওপর একটি দেশের, একটি জাতির সম্মান ও মর্যাদা নির্ভর করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের একসময়কার জাঁদরেল রেফারি নিকোলাই গাবরিলোভিচ লাতীশেভ হিসাব করে দেখেছেন, ৯০ মিনিটের আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের এই খেলায় রেফারিরা দৌড়ে থাকেন গড়ে প্রায় ১২/১৩ কিলোমিটার অর্থাৎ ৭/৮ মাইলের মত। সুতরাং এত পরিশ্রম ও সম্মানের কাজ করে এত অসতর্ক ও অসম্মানজনক সিদ্ধান্ত দেয়া কোনো রেফারিরই উচিত নয়।

প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ফুটবল খেলার নৈপূণ্য হচ্ছে পায়ে। যার পা যত জোরে লাথি দিতে পারবে, যার পা দিয়ে যত সুন্দরভাবে প্রতিপক্ষকে ডস্ দিতে পারবে, যার পা খেলায় যত সুন্দর নৈপুণ্য দেখাতে পারবে সে তত নামী খেলোয়াড়-দামী খেলোয়াড়। যেমন ম্যারাডোনা, হ্যাজী, রোমারিও, বেবেতো, ব্যাজ্জিও, ডাহলিন এমনি আরো অনেকেই। কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে আছেন পেলে শুধু এই পা-এর গুণে। কারণ পেলে অত্যন্ত নিপুণ শিল্পীর মত লাথি দিতে পারতেন বল-এ। আবার ঠিকভাবে লাথি দিতে না পারলে আত্মঘাতী গোল হয়। আর তার ফলশ্রুতিতে এই নিষ্ঠুর পৃথিবী ক্ষমা করে না। তার প্রমাণ কলম্বিয়ার এসকোবার। তার কারণে একটি আত্মঘাতি গোল হওয়ায় স্বদেশে অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীর গুলিতে তিনি প্রাণ হারান। (তার আত্মার শান্তি কামনা করছি)। তবে হ্যাঁ, এই লাথি দিতে হবে বলকে, খেলোয়াড়কে নয়। তাহলেই ফাউল। বিনিময়ে হলুদকার্ড লালকার্ড কিংবা পেনাল্টি। জোরে সুন্দরভাবে লাথি দিয়ে বেশি গোল করতে পারলে শ্রেষ্ঠ গোলদাতার সম্মানও পাওয়া যায়। যেমন—'৯৪ এর বিশ্বকাপে রাশিয়ার সালেঙ্কো, বুলগেরিয়ার স্টইচকভ, জার্মানির ক্লিন্সমান—সবাই ৬টি করে গোল করে শীর্ষে আছেন। তবে ৭টি কেউ করতে পারলেই পায়ের কারণে আরো একটি বিশ্ব রেকর্ড হত। সেমিফাইনাল পর্যন্ত ৫০টি ম্যাচে গোল হয়েছে সর্বমোট ১৩৭টি। এসকোবারের গোলটি বাদ দিলে বাকি ১৩৬টি গোল করেছেন ৭৮ জন। এদের পা এখন ধন্য। নিজ দেশসহ সারাবিশ্বে এদের পায়ের কারণে চাহিদা বেড়ে গেছে।

ধন্য ধন্য পা। চারদিকে পায়ের জয় জয়কার। একটি বলকে কেন্দ্র করে এই ২২ জন খেলোয়াড়ের পায়ের নৈপুণ্য দেখতে সারা বিশ্বে কোটি কোটি ডলারের খেলা চলছে। পা নিয়ন্ত্রিত এই খেলা এখন গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ। পায়ের জন্য খেলোয়াড়রা পাচ্ছেন তারকা খ্যাতি। বেড়ে যাচ্ছে চাহিদা। রাষ্ট্রপ্রধানরা পর্যন্ত তাদের খেলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলো উপার্জন করছে কোটি কোটি ডলার। মানুষের ঘুম নিদ্রা নেই। মধ্যরাতে রাস্তায় মানুষ, বাড়িতে বাড়িতে সবাই সজাগ। গোল গোল চিৎকার। খেলা দেখতে দেখতে একাকী কোনো বয়ঃবৃদ্ধ তার

পছন্দের কোনো খেলোয়াড়ের প্রশংশা করে বলে উঠেন 'আহা পায়ের কি নৈপূণ্য।' বাজিকরেরা লাখ লাখ ডলার বাজি ধরছে খেলোয়াড়দের পায়ের নৈপুণ্যের ওপর। জ্যোতিষরা ভবিষ্যদ্বাণী করছে।

সুতরাং এই ফুটবল খেলা প্রমাণ করেছে—মানুষের পায়েও প্রতিভা আছে। তবে দুঃখ—আমাদের দেশে প্রতিভাবান অনেক মানুষ রয়েছেন ; কিন্তু প্রতিভাবান পা নেই। আমরাও খুব নিপুণভাবে লাথি দেই। তবে বলে নয়, একে অন্যকে। সবল দুর্বলকে। যে আত্মঘাতী লাথি আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে পেছনের দিকে। যার ফলে আমরা গোল খেয়েই যাচ্ছি। যেতে পারছি না অভীষ্ট গোলপোস্টে। দিতে পারছি না গোল।

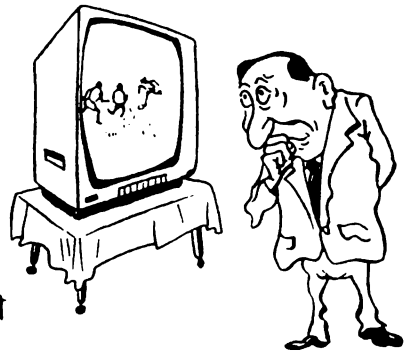

বিশ্বকাপ ফুটবল এবং আমরা

বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা শুরুর আগে, খেলার সময় এবং খেলা শেষে সারা বিশ্বে আলোচনা সমালোচনার প্রধান বিষয় হয়ে উঠে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা। এ লেখা লিখছি ১৫তম বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা উপলক্ষে। সারা বিশ্বের প্রায় ২৪টি দেশ ১৭ জুন আমেরিকার নয়টি শহরে ১৫তম বিশ্বকাপের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই সময় অংশগ্রহণকারী এই ২৪টি দেশের ফুটবল অনুরাগীরা ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য স্থানের ফুটবলপ্রেমীরা তাদের নিজ নিজ পছন্দের দলের বিজয়ের সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা-কল্পনায় ব্যস্ত থাকে। কারণ, জনপ্রিয়তার নিরিখে ফুটবল অন্য যে কোনো খেলার চেয়ে অনেক অনেকগুন এগিয়ে আছে। তাই ফুটবলের নামে বিশ্বের অধিকাংশ ক্রীড়ানুরাগী উন্মাতাল হয়ে ওঠে। বিশ্বজুড়ে সবাই বিশ্বকাপ নিয়ে মেতে উঠে। কে জেতে কে হারে। কারা ভালো খেলবে? কোন কোন দল সেমিফাইনালে উঠবে, কারা খেলবে ফাইনাল, কোন দল হবে বিশ্বকাপ বিজয়ী, কোন কোন সুপারষ্টার দেখাবে নৈপুণ্য? কেউ বলেন—রোমারিও ডি সুজা, কেউ বলেন—হ্যাসলার, কারো মতে-অ্যাসপ্রিলা, রবার্তো ব্যাজিও, গাব্রিয়েলা আর ম্যারাডোনা তো আছেই। জল্পনার শেষ নেই, কল্পনারও শেষ নেই। ১৯৫৮ সালে জাদুকরী গোল দিয়ে যে পেলে বিশ্ববাসীর মন জয় করেছেন কিংবা হালের ম্যারাডোনা—এদের আসনে নতুন তারকা হয়ে কে আসছেন? বাজিকরেরা দলগুলোর সাফল্য ও ব্যর্থতার নিরিখে বাজির মূল্যও নির্ধারণ করেছেন। বিশ্বকাপ নিয়ে উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায় আমাদের দেশের ক্রীড়ামোদীরাও প্রতীক্ষার প্রহর গুনেছেন।

এমনিতেই আমরা মোটামুটি হৈ চৈ এর মধ্যেই থাকি। এই বিশ্বকাপ প্রসঙ্গ এতে একটু বাড়তি মাত্রা সংযোজন করে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছে দেশে কোনো সমস্যা নেই। একমাত্র বিষয় হচ্ছে এই বিশ্বকাপ। পত্রপত্রিকায় বিশেষ রঙিন পাতা বেরোয়। সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর প্রচ্ছদের বিষয় থাকে এই বিশ্বকাপ ফুটবল। এক

সংখ্যা বের হলে পরবর্তী সংখ্যাও যে বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে, সেই বিষয়ে আগাম বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয় কাগজে। কেউ কেউ লাখ লাখ টাকার আকর্ষণীয় পুরস্কারও ঘোষণা করেন। কাগজের পাতা উল্টালে সবগুলো পত্রিকাতেই এ সম্পর্কিত খবর মোটামুটি একই রকম। যেমন—কার সঙ্গে কার লড়াই হবে, কে হবেন সেরা খেলোয়াড়, খেলোয়াড়দের পরিচিতি, খেলার সিডিউল, তারকাদের বিভিন্ন খবর, বিশ্বকাপ ফুটবলের শুরু থেকে এ পর্যন্ত একটা মোটামুটি খতিয়ান ইত্যাদি ইত্যাদি। এ-ছাড়া সিনে ম্যাগাজিনগুলোর বিষয়ও যেন একটি। বিশ্বকাপ নিয়ে তারকারা কী ভাবছেন। ভাবখানা এই, তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার কিংবা দর্শকদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ককটেল, বোমাবাজি, গোলাগুলিও হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা যাতে পরীক্ষা বাদ দিয়ে, লেখাপড়া বাদ দিয়ে পরম আয়েশে এবং নিশ্চিন্তে বিশ্বকাপ খেলা উপভোগ করতে পারে সে জন্য তাদের পরীক্ষাও পিছিয়ে দেওয়া হয়। এর প্রমাণ '৯৪ সালের বিশ্বকাপে পাওয়া গেছে। প্রতি চার বছর পর পর সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে এই বিশ্বকাপ ভাইরাসে আক্রমণ করে। তবে আমাদের দেশে এই ভাইরাস সবদিক থেকে যেরকম প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত করে অন্য কোথাও (বিশেষ করে যেসব দেশ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করে নি) এটা করে কিনা আমার জানা নেই।

অফিস আদালত, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, রাস্তাঘাটে, হোটেল রেস্তোরাঁয় সব জায়গাতেই আলোচনার বিষয় ছিল একটিই—বিশ্বকাপ আর বিশ্বকাপ। কিন্তু যে দেশে এই বিশ্বকাপ খেলার আয়োজন করা হয়েছে সেখানেও নাকি এই খেলা আকাংক্ষিত উন্মাদনার সৃষ্টি করতে পারেনি। হয়নি কোনো ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া কিংবা কোনো গোলাগুলি। সবাই যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। দুই-তৃতীয়াংশ লোক নাকি খেলা চলার সময়ও জানতেন না যে এই ধরনের একটি বিশাল ব্যাপার হচ্ছে তাদের দেশে—যে বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের মতো অনুন্নতশীল দেশেও খুশির জোয়ার বইছে। আমেরিকার অধিবাসীরা কাজকর্ম বন্ধ করা তো দূরের কথা যেখানে বিশ্বকাপ খেলা সম্পর্কে জানেনই না সেখানে আমাদের দেশে অনেকে কাজকর্ম বন্ধ করে দেন।

বিশ্বকাপ ফুটবল আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমন কি প্রাত্যহিক জীবনেও গুরুতর' প্রভাব ফেলেছিল।

সামান্য পণ্যের বিজ্ঞাপনেও এই বিশ্বকাপ ভর করেছিল। একটি দৈনিকে দেখেছিলাম বিজ্ঞাপনের ভাষা হচ্ছে, বিশ্বকাপ নিয়ে বিতর্ক হতে পারে কিন্তু আমাদের অমুক পণ্য নিয়ে কোনো বিতর্ক হতে পারে না।" শুধু তাই নয়,

স্টেডিয়াম মার্কেটে টেলিভিশন সেটের বিক্রি বেড়ে যায়। কারণ, সবাই বিশ্বকাপ খেলা দেখবেন। টেলিভিশনের ক্রটি সারাই দোকানে ও ছিল প্রচণ্ড ভিড়। কারণ খেলা দেখার সময় যাতে টেলিভিশন কোনোরকম ডিস্টার্ব না করে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চান সবাই।

শুধু তাই নয়, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনেরা একে অন্যকে দাওয়াত দিয়েছেন। উদ্দেশ্য একসঙ্গে বসে খেলা উপভোগ করবেন। স্ত্রীরা টেনশনে ছিলেন। কারণ, রোযার মাসের মত ভোররাতের জন্য বাড়তি খাবার তৈরি করতে হবে। কী কী ম্যানু হবে এটাও ছিল আলোচনার একটি বিষয়। ফুটবল খেলা তো আমরাও খেলি। স্থানীয়ভাবে খেলা দেখতে গিয়ে কিংবা খেলতে গিয়ে আমরাও উন্মাতাল হয়ে উঠি। কখনো গাড়ি ভাঙ্গি, কখনও-বা জীবন চলে যায়। অথচ আন্তর্জাতিক ম্যাচে আমাদের করুণ অবস্থা। '৯৪ এর সাফ গেমসে আমাদের ব্যর্থতার কথাটা চিন্তা করুন। ভাবতেই লজ্জা হয়। ফুটবলে আমাদের এই 'মাজুল' অবস্থা কেন? বহু বছর আগ থেকেই আমরা ফুটবল খেলছি। অনেক নতুন নতুন দেশ অস্বাভাবিক নৈপূণ্য দেখিয়ে ঠাঁই করে নিয়েছেন বিশ্ব ফুটবলের আসরে। অথচ আমরা পড়ে আছি অনেক পেছনে। কিন্তু এই ফুটবলের ওপরেই ছিল আমাদের সবার বেশি প্রত্যাশা। দেশে খেলাধুলার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আসলে তা ফুটবলই এনে দেবে—এ বিশ্বাস আমাদের অনেকেরই ছিল। কিন্তু ক্রমাগত ব্যর্থতায় আমাদের সে আশা ভেঙে গেছে। ভর করেছে হতাশা।

ক্যামেরুন, নাইজেরিয়ার মত দেশ যদি ফুটবলে চমক আনতে পারে, তবে আমরা কেন পারব না, ঐ সব দেশ তো আমাদের চেয়ে খুব একটা উন্নতও নয়। ওরা পারলে আমরা কেন পারব না? আমরা কি ব্যর্থ হয়েই থাকব? আমাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা, উত্তেজনা, অর্থ-এসবের কি তেমন কোনো অভাব আছে? লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আমরা বিদেশি খেলোয়াড়ও নিয়ে আসি। নিয়ে আসি বিদেশি কোচ। তারপরও আমাদের প্রতিযোগিতা হয় নিজেদের মধ্যে। কখনোই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তেমন সুফল আনতে পারি না। আমাদের পরে যারা খেলা শুরু করেছেন তারা এগিয়ে যাচ্ছেন। আমরা পুরোনো হয়েও পিছিয়ে যাচ্ছি। আমরা মেতে উঠছি পৃথিবীর কোন দেশ জিতবে সেই চিন্তায়। বাজি ধরছি বিভিন্ন দেশের জন্য। রাত জেগে অন্যের খেলা দেখে আনন্দ উপভোগ করছি। কিন্তু পাশাপাশি বিশ্বকাপের ঐ মাঠে যদি বাংলাদেশের ফুটবল দল থাকত—তাহলে আমাদের কেমন লাগত? একটু ভাবুন তো! বিশ্বাস করলাম, হয়ত জিততে পারতাম না। কিন্তু সারা বিশ্বে এই দেশ, এই মানচিত্র, এই জাতি পেত নতুন পরিচয়। সারা বিশ্ব জানে ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, বস্তি—এই নিয়ে আমরা বেঁচে

আছি। তারপরও আমাদের মধ্যে যে প্রাণশক্তি রয়েছে, রয়েছে জাতি হিসেবে গর্ব করার মতো অনেক কিছু, আমরাও পারি বিশ্বদরবারে যে কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে—গর্বে আমাদের বুকটা ভরে যেত। যারা খেলছেন এবং যারা খেলাচ্ছেন তারা কি এ-কথাটি ভাবেন না? যদি ভাবেন, তাহলে কেন খুঁজে দেখছেন না এই ব্যর্থতার কারণ? আমরা আর কতকাল এভাবে অন্যের খেলা দেখবো? সেদিন কবে আসবে যেদিন আমরা এই বিশ্বকাপের মাঠে নিজের দেশকে দেখে, নিজের দেশের খেলোয়াড়দের দেখে আনন্দে চিৎকার করে বলবো—'সাবাস বাংলাদেশ, সাবাস!'

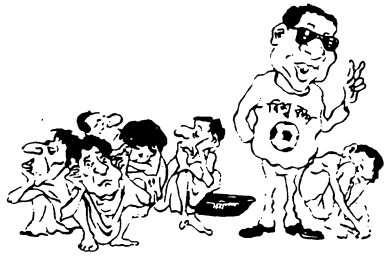

বিশ্বকাপের প্রভাব

বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার সময় সারাবিশ্বে একটিই তাজা খবর। আর তা হচ্ছে বিশ্বকাপ। চারদিকে উত্তেজনা, উদ্দীপনা, উন্মাদনা। সারা বিশ্বকেই মাতিয়ে রাখে বিশ্বকাপ ফুটবল। সব শ্রেণীর মানুষকেই তাই খেলার সময় যেন চুম্বকের মত টেনে নিয়ে যায় টিভি সেটের সামনে। সবাই খেলা দেখেন, খেলার খবর পড়েন। আলোচনার ঝড় তোলেন চারদিকে। উচ্চ থেকে মধ্যবিত্ত পর্যায়ের অধিকাংশ মানুষকেই প্রভাবিত করে বিশ্বকাপ ফুটবল। বলাবাহুল্য প্রভাবিত করে আমাকেও। যার ফলশ্রুতি—বিশ্বকাপ নিয়ে এতগুলো লেখা। বহু বিষয়েই লিখতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু বিশ্বকাপের সামনে সব বিষয়ই যেন ম্লান হয়ে যায়। মনে হয় অন্য বিষয়গুল যেন বিশ্বকাপের কাছে নিষ্প্রাণ। তবে পার্থক্য এটুকু—বিশ্বকাপ নিয়ে লেখার মত যোগ্যতা আমার নেই। কারণ আমি খেলোয়াড় নই, কিংবা নই কোনো ভাষ্যকার কিংবা কোচ। অথবা এই খেলার বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কেও আমার কোনো ধারণা নেই। তবে সান্ত্বনা এটুকু যারা খেলা দেখেন তাদের সিংহভাগই আমার মতো দর্শক এবং নিয়মটিও হচ্ছে তাই—খেলোয়াড়রা খেলবেন দর্শকরা দেখবেন। এই দেখতে গিয়ে যাদের বা যার খেলা দর্শকদের হৃদয় ছুঁয়ে যায় তিনিই পান তারকাখ্যাতি। যেহেতু খেলার কলাকৌশল বা টেকনিক সম্পর্কে আমার জ্ঞান সীমিত, তাই এই লেখায় কোন দল বা খেলোয়াড়ের খেলার নৈপূণ্য বা ভুলত্রুটি নিয়ে কিছু লিখবো না এবং সেই সাহসও আমার নেই। শুধু বিশ্বকাপ আমাদের কিভাবে প্রভাবিত করে তারই কয়েকটি চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করবো। বিদেশের কথাই ধরুন—বিশ্বকাপের দর্শক-গ্যালারিতে বিভিন্ন দেশের দর্শকরা আসেন। দর্শক-সমর্থকদের আচরণের মাধ্যমে তাদের চরিত্রের কিছুটা নমুনা পাওয়া যায়। এদের সামলাতে গিয়ে পুলিশরাও বেশ বেকায়দায় পড়েন। কারণ এই খেলা দর্শক-সমর্থকদের এতোটাই প্রভাবিত করে যে, কোন দর্শক কখন কি আচরণ করে বসেন তার ঠিক নেই। দুঃশ্চিন্তা ও বিপত্তি সেখানেই। তবুও '৯৪ সালের বিশ্বকাপের

একটি চিত্র দেয়া যাক। 'সবসময় কর্তৃপক্ষ দর্শকদের সঙ্গে মার্কিন পুলিশদের সমঝোতাপূর্ণ আচরণ করার পরামর্শ দিয়েছিল। পুলিশ কর্তৃপক্ষ খেলা শুরুর কয়েকদিনের মধ্যেই বিভিন্ন দেশের দর্শক-সমর্থকদের আচরণের কিছুটা নমুনা পেয়ে গেছেন। যেমন প্রকৃতিগতভাবে নাইজেরীয়ার সমর্থকরা শান্ত, আর্জেন্টাইনরা একটু লাজুক, আবার দক্ষিণ কোরীয়রা একটু ঠেলা ধাক্কার পক্ষপাতি, তবে অভদ্র নয় এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, স্পেনীয়রা চিল্লাচিল্লি বেশি করেন, ঢোল বাদ্য নিয়ে নৃত্য করতে পছন্দ করেন বেশি। বুলগেরিয়রা একটু হতবুদ্ধি এবং গুরুগম্ভীর। জার্মান দর্শকরা মুখে রঙ-ঢঙ মেখে সং সেজে আনন্দ উল্লাস করে থাকেন। রঙ-বেরঙের পতাকা বহন করেন এবং ঢেউ খেলে থাকেন। বিশ্বকাপ কয়েদিদেরও প্রভাবিত করে। জেল ভেঙে প্রায় ১৪ শত কয়েদি পালানোর পরিকল্পনা নিয়েছিল ব্রাজিলে। প্রথম খেলায় জিততে না পারায় ইতালিতে আবার কোচ সাচ্চির চৌদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করা হয়েছে পত্র-পত্রিকায় এবং আলোচনায়। আলবেনিয়ার রাজধানী তিরানাতে ফুটবল প্রেমিকদের জন্য একটি বিশাল টেলিপর্দা সেট করা হয়েছিল। রাজধানীর প্রধান প্রকৌশলী মাইকে খেলা দেখার আহবানও জানিয়েছিলেন। যদিও ইউরোপের দরিদ্রতম দেশ আলবেনিয়া বিশ্বকাপে সে বছর উঠতে পারে নি। কিন্তু খেলার উন্মাদনা ছিল। এসবই পত্রিকার খবর এবং ঘটনা। এমনি হাজারো ঘটনা ঘটছে দেশ-বিদেশে এই বিশ্বকাপকে ঘিরে।

'৯৪ সালের বিশ্বকাপ যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হলেও সে দেশের ক্রীড়ানুরাগী মানুষ বেসবল, বাস্কেটবল, রাগবী নিয়েই মেতে ছিলেন। বিদ্যুৎ গতির খেলায় দ্রুত গোল ও পয়েন্ট হওয়ায় ওরা অভ্যস্ত। ওদের যুক্তি হল গতির যুগে এখনো এত ধীরগতি কেন? তবুও সেদেশে বিশ্বকাপের আয়োজনের কারণ একটি যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশকে যদি ফুটবল খেলায় প্রভাবিত করা যায় তাহলে ফুটবল বিশ্ব আরো উন্নত হবে। খেলা শুরুর আগেই তাই যুক্তরাষ্ট্রের দর্শকদের প্রভাবিত করা যাবে কিনা এ নিয়ে অনেকেরই সংশয় ছিল। কিন্তু পরে কিছুটা আশার আলো দেখা দিয়েছে। কারণ যুক্তরাষ্ট্র সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় ড্র করে এবং অন্যতম ফেবারিট কলম্বিয়াকে ২-১ গোলে পরাজিত করে গত ৪৪ বছরের ইতিহাসে প্রথম জয়ের মুখ দেখে। সেই সুবাদে খেলোয়াড়দের পাশাপাশি এই আনন্দের জোয়ার কিছুটা দর্শকদের মধ্যেও এসেছে। এই সাফল্যের কারণে অজনপ্রিয় ফুটবল আমেরিকায় কিছুটা হলেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। স্টেডিয়ামে উপস্থিত হাজার হাজার মার্কিন দর্শকের আনন্দ উচ্ছ্বাস থেকে তা কিছুটা আঁচ করা গেছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে ফুটবল এমন এক খেলা যা সবাইকে এক সময় না এক সময় প্রভাবিত করবেই। এতো গেল বিদেশের কিছু খণ্ড চিত্র। এবার দেশের প্রসঙ্গে

আসি। বিশ্বকাপের প্রভাব আমাদের যেমন সুফল এনে দিয়েছে তেমনি কিছু কুফলও এনেছে। সুফল দিয়েই শুরু করা যাক—চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইয়ের কারণে প্রতিটি মুহূর্তে যখন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয় আমাদের—এই বিশ্বকাপ-এর সময়ে সেই ভয়টি অন্তত কিছুদিনের জন্য কেটে। কারণ চোর'রা দর্শকদের রাত্রি জাগরণের কারণে রাতে বেশ একটা সুবিধা করতে পারে না। এই সময়ে বাড়িতে বাড়িতে চিৎকার চেঁচামেচি-আনন্দ-উল্লাসের কারণে সারা বাড়ি দিনের মতই কোলাহলমুখর থাকে। যার ফলে রাতটা চোরের জন্য হয়ে যায় দিনের মত বিপজ্জনক। দ্বিতীয় সুফল হচ্ছে—ভোর রাতের খেলাগুলো দেখার কারণে অফিস-আদালতে সঠিক সময়ে চাকরিজীবীদের হাজিরা পাওয়া যায় অর্থাৎ সময়ানুবর্তিতা বেড়ে যায়। কারণ ৮টায় অফিস হলেও অধিকাংশ অফিসেই ৮টায় চেয়ারশূন্য থাকে। ঐসব চেয়ার পূর্ণ হতে হতে ৯/১০টা বাজে। কিন্তু খেলার জন্য ৫-৩০টায় উঠতে হয় বলে সবাই অফিসে আসেন সময়মত। এদিকে আমাদের এই খবর প্রধান দেশে বাড়তি খবর হয়ে আসে বিশ্বকাপ। যার ফলে কিছু কিছু পত্র পত্রিকার পাতা ভরাতে বিশ্বকাপ বেশ সাহায্য করে। এরকম অনেক সুফল যেমনি রয়েছে তেমনি কুফলও রয়েছে। যেমন বিশ্বকাপের প্রভাবে চারদিকে তুমুল আলোচনা-স্বামী-স্ত্রীতে, বন্ধু-বন্ধুতে, বন্ধু-বান্ধবীতে, কর্মকর্তা-কর্মচারী সবার আলোচনার বিষয় হয় এই বিশ্বকাপ। এবার এ-ধরনের একটি আলোচনার চিত্র তুলে ধরছি। আলোচনাটি দুই বন্ধুর মধ্যে আলোচনার দিন হচ্ছে ২২ জুন '৯৪। প্রসঙ্গ, আগের রাতে দেখা আর্জেন্টিনা-গ্রীসের খেলা ও ম্যারাডোনা।

১ম বন্ধু : দোস্ত কালকে ম্যারাডোনার খেলা দেখছস?

২য় বন্ধু : ম্যারাডোনার খেলা কই। খেলা তো দেখাল বাতিস্তুতা।

(বলাবাহুল্য দ্বিতীয় জন ম্যারাডোনাকে পছন্দ করে না)।

১ম বন্ধু : বাতিস্তুতারে তো খেলা ম্যারাডোনাই শিখাইছে। শোন ম্যারাডোনা ম্যারাডোনাই। সে জন্য সে ক্যাপ্টেন।

২য় বন্ধু : ঐ বেটা—ম্যারাডোনা বল ধরনের আগে কাইত হইয়া পইড়া যায়। ভাব দেখায় যেন তারে কেউ লাথি মারছে। জীবনে একটা ভালো গোল দিছিল বইলা পত্র-পত্রিকায় তারে স্টার বানাইয়া দিছে।

১ম বন্ধু : আরে শোন এইবারও তো একটা গোল দিছে। কতো সুন্দর গোল দেখছস।

২য় বন্ধু : ঐ গোলটা দিছে বইলা ইজ্জত বাঁচছে। তবে বাতিস্তুতা তো তিনটা গোল দিল। বিশ্বকাপে প্রথম হ্যাটট্রিক করল। তার কথা কস না কেন?

১ম বন্ধু : তারে তো বল বানাইয়া দিছে ম্যারাডোনাই—

২য় বন্ধু : ঐ বেটা খেলা দেখছস? নাকি, না দেইখাই কথা কস। শোন—ম্যারাডোনার দিন শেষ। দেখস্ নাই শেষের দিকে তারে তুইলা দিল। ক্যাপ্টেনরে কেউ তুইলা দেয়?

১ম বন্ধু : যাতে ইনজুরি না হয় সেজন্য তুইলা দিছে। দামি প্লেয়ার তো, বুঝছস?

২য় বন্ধু : এইটা ঠিকই কইছস। যেভাবে কেউ ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিৎ-কাইত হইয়া যায়, তাতে নিজের দোষে নিজেই হাত-পাও ভাইঙ্গা ফেলতে পারে। তার ভাবেসাবে মনে হয় ৪টি গোল ও-ই দিছে অথচ দেখ বাতিস্তুতা—কোনো প্রতিক্রিয়া নাই, জাত খেলোয়াড় হইল ওরাই।

১ম বন্ধু : ম্যারাডোনা সম্পর্কে তোর মতো দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষের মন্তব্য শুইনা লাভ নাই।

২য় বন্ধু : কি কইলি তুই আমারে দুই নম্বর মানুষ কইলি। আরে ঐ তুইতো ম্যারাডোনার মত ১০ নম্বর—

১ম বন্ধু : তুই আমারে গালি দে অসুবিধা নাই, আমার ম্যারাডোনারে কিচ্ছু কবি না। তাইলে কিন্তু চাপার হাড্ডি খুইলা ফালামু।

২য় বন্ধু : কী? (উত্তেজনা বাড়ছে)

এভাবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে হতে অন্য খেলার দিকে মোড় নিল। যে খেলায় আমরা বেশ পারদর্শী এবং বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে খেলছি। এ খেলার নাম মরণ খেলা। কিন্তু দুঃখ একটিই আমরা সারা জীবন এই মরণ খেলাতেই পারদর্শিতা দেখালাম। দেশের মান বাড়বে, মুখ উজ্জ্বল হবে এমন খেলা দেখাতে পারছি না। পারব কি কখনো?

নিখোঁজ লাগেজ

গত ১৮ সেপ্টেম্বর '৯৪ লণ্ডনে 'মিস বেঙ্গলি' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য দেশের বেশ কিছু খ্যাতিমান শিল্পী ঢাকা থেকে লণ্ডন যান। অনুষ্ঠানে প্রাথমিক নির্বাচনে যেসব সুন্দরী নির্বাচিত হন চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য, তাদের কোরিওগ্রাফি ক্যাটওয়াক অর্থাৎ হাঁটাচলা পারফরমেন্স ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য এই প্রতিযোগিতার আয়োজক 'লিংক প্রমোশন' বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না মডেল তারকা বিবি রাসেলকে নিয়ে যান। উল্লেখ্য, বিবি অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই এইসব মডেলকে সার্থকভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে মঞ্চে উপস্থাপন করেছিলেন। লন্ডনের অভিজাত মিলনায়তন রয়েল থিয়েটারে এসব মডেলের পারফরমেন্স দেখে মনেই হয় নি তারা সবাই নতুন এবং এই প্রথমবারের মত এ-ধরনের আর্ন্তজাতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন। উক্ত অনুষ্ঠানের উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলাম আমি এবং সুচিত্রা কন্যা মুনমুন সেন। ওপরের কথাগুলি এ-জন্যই লিখলাম—এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না মডেল তারকা বিবি রাসেলের একটি লাগেজ এই লেখার উৎস। আমি সপরিবারে গত ২২ সেপ্টেম্বর '৯৪ অনুষ্ঠানশেষে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে চেপে ঢাকা চলে আসি। আর বিবি রাসেল বাংলাদেশ বিমানে করে ২৫ সেপ্টেম্বর আসেন। এর কদিন পরেই বিবির সঙ্গে আমার দেখা হয় সাপ্তাহিক বিচিত্রার সম্পাদকের কক্ষে। দেখা হতেই বিবি অনেকটা আক্ষেপের স্বরে বললেন কত কিছু করেন এসব নিয়ে কিছু করতে পারেন না?

জিজ্ঞেস করলাম 'কী সব'?

তারপর তিনি ঘটনাটি খুলে বললেন যার সারমর্ম হল—বিমানে ফিরে এসে তিনি তার লাগেজ পান নি। এ নিয়ে তিনি বিমানের বিভিন্ন মহলে নাকি অভিযোগও করেছেন কিন্তু এই লেখা যখন লিখছি (৬ সেপ্টেম্বর '৯৪) তখন পর্যন্ত তিনি তার লাগেজটি পান নি। এ নিয়ে বিবির মনটা বেশ খারাপ। খারাপ হবার কারণ

লাগেজের জিনিসপত্র নয়--উক্ত লাগেজে তার কিছু মূল্যবান কাগজপত্রও নাকি ছিল। এবার এর পাশাপাশি আর একটি চিত্র তুলে ধরছি, সেটিও ঘটেছে আর একজন খ্যাতিমান শিল্পী—সাবিনা ইয়াসমীনের ক্ষেত্রে। আর তাও একটি লাগেজ নিয়ে। তবে পার্থক্য তার লাগেজটি হারিয়েছে বিদেশে আর বিবিরটি স্বদেশে। লণ্ডনের অনুষ্ঠানে যোগ দেবার আগে সাবিনা ইয়াসমীন, সঙ্গীত পরিচালক মিন্টু এবং সপরিবারে আমি নিউজার্সিতে বাংলাদেশ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য সরাসরি ঢাকা থেকে ইউ,এস,এ যাই। সম্মেলন শেষে গত ৭ সেপ্টেম্বর ফ্লোরিডায় এবং ১০ সেপ্টেম্বর ফ্লোরিডা থেকে শিকাগো হয়ে লস এঞ্জেলেসে যাই এবং লস এঞ্জেলেস থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে ফিরে আসি। প্রায় প্রতিটি স্থানে যেতে-আসতেই প্লেনে ৬/৭ ঘণ্টা করে সময় লেগেছে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে কোথাও কোনো অঘটন না ঘটলেও ১৫ সেপ্টেম্বর যখন সব অনুষ্ঠান শেষ করে নিউইয়র্কে ফিরে এসেছি লণ্ডন যাবার উদ্দেশ্যে, সেদিনই ঘটল অঘটনটি। অর্থাৎ লসএঞ্জেলেস থেকে নিউইয়র্ক এসে বিমানবন্দরে নেমে ব্যাগেজ ক্লেইম বিভাগে গিয়ে দেখি আমাদের বুক করা পাঁচটি লাগেজের মধ্যে একটি নেই। স্থানীয় ব্যাগেজ সার্ভিস, বিভাগে জানালাম। তারা আমার কাছে লাগেজ টেগ্ চাইলেন। দিলাম। ব্যাগেজ সেকশনের কর্মী গুনে দেখেন ৪টি টেগ রয়েছে। সুতরাং তিনি স্বাভাবিকভাবেই যা বললেন তা হল, আমাদের ৪টি লাগেজ এবং টেগও ৪টি। সুতরাং সমস্যাটা কোথায়? আমরাও সমস্যায় পড়ে গেলাম। কারণ কথাতো ঠিক।

আমরা পাঁচটি লাগেজ বুক করেছিলাম। তাহলে পাঁচটি টেগ থাকার কথা। কিন্তু আর একটি টেগ কোথায়? বলাবাহুল্য উক্ত লাগেজটি ছিল সাবিনা ইয়াসমীনের। স্বভাবতই লাগেজ না আসায় তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। পাশাপাশি আমারও। কারণ টেগগুলো আমার কাছেই ছিল। চিন্তায় পড়ে গেলাম—টেগ ছাড়া ব্যাগেজ ক্লেইমই বা করি কী করে? পুরো ব্যাপারটি জন, এফ, কেনেডি এয়ারপোর্টের ব্যাগেজ সার্ভিসকে জানালাম। কম্পিউটারে সব কিছু চেকআপ করে তিনি কোনো সদুত্তর পেলেন না। পরে আমাদের স্থানীয় ঠিকানা রেখে দিয়ে বললেন "ডোন্ট ওয়ারী, উই উইল ট্রাই টু গেট ইট"।

বিষণ্ন অবস্থায় চলে এলাম। সেদিন আর লণ্ডন আসা হল না। বিকেলে এয়ারপোর্টে আবারো ফোন করলাম—তারা জানতে চাইলেন লাগেজটি কেমন দেখতে? এর ভিতরে কী ছিল যতদূর মনে ছিল সাবিনা ইয়াসমীন বললেন। এবার লণ্ডনে তার অবস্থানের ঠিকানা দিয়ে আমরা লণ্ডন চলে এলাম পরদিন সকালে। লণ্ডন গিয়েই একটা শুভ সংবাদ অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। আর তা হচ্ছে সাবিনা ইয়াসমীনের দেয়া ঠিকানায় আমাদের পৌছানোর কিছুক্ষণ আগেই সেই

হারানো লাগেজ পৌঁছে গেছে এবং যিনি পৌঁছে দিয়েছেন তিনি লাগেজ প্রাপ্তির এই বিলম্বের জন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমাও চেয়েছেন। সাবিনা ইয়াসমীন খুশি হলেন। আমিও বেশ খুশি হলাম। সাবিনা ইয়াসমীনের জন্য মন খারাপের কারণ ছিল—উক্ত লাগেজে তার গানের সব কর্ডগুলো লেখা ছিল। যাকগে, লাগেজটি পেয়ে ওদেশের এয়্যারলাইন্সগুলোর নিয়ম দেখে মুগ্ধ হলাম। টেগবিহীন একটি লাগেজ সুদূর লসএঞ্জেলেস থেকে লন্ডনের ব্রীকল্যাণ্ডের একটি বাসায় পৌঁছে গেল দুদিনের মধ্যেই। আর ঢাকা এসে বিবি রাসেলের কাছে যখন তার লাগেজ হারানোর ঘটনা শুনলাম তখন তাকে সাবিনা ইয়াসমীনের লাগেজ হারানো ও প্রাপ্তির ঘটনাটি বললাম।

সব শুনে তিনি বললেন, 'এবারে বুঝুন আমাদের অবস্থাটা'। বিবিকে কী জবাব দেব? অবস্থাটা আমার মতো অনেকেই দেখছেন, বুঝছেন। কিন্তু করছেন না কেউ কিছু।

চুলকানি

না—কোনো হারবাল মেডিসিনের বিজ্ঞাপন নয়। শিরোনাম দেখে অনেকেরই খারাপ লাগা স্বাভাবিক। 'হস্তদ্বারা' প্রতিনিয়ত এর কার্যকারিতা চালালেও শব্দটির মধ্যে একটু হালকা, চটুল, স্থূল কিংবা কারো কাছে অশ্লীলতার গন্ধ লাগতে পারে। সাহিত্যের বিচারে চুলকানি শব্দটির গুরুত্ব তেমন না থাকলেও অনেকেরই কিন্তু চিন্তার বিষয় এই চুলকানি। এর সঙ্গে সমস্ত সমাজ এবং ব্যাপক অর্থে বাঙালি জাতি জড়িয়ে পড়েছে। চুলকানি বলতে আপন হস্তে নখাগ্র দ্বারা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে চাহিদা অনুযায়ী আঁচড় কাটা। এতে তাৎক্ষণিকভাবে কিছুটা শান্তি নাকি পাওয়া যায়। যেহেতু আমি কোনো চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ নই, তাই এর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব না। তাহলে হঠাৎ এই চুলকানি প্রসঙ্গ কেন? ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে, শহর-বন্দর-গ্রামে এবং এই রাজধানীতেও চুলকানির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। চলায়-বলায়, ব্যবসায়, অবসরে চুলকানি আছেই। ভাবখানা এমন—দিকে দিকে একি শুনি চুলকানি চুলকানি। ব্যাপারটা ফানি মনে হলেও—কিংবা কেউ প্রাণদণ্ড দিতে চাইলেও অনেকেই বলেন—আমাদের জীবনের মানদণ্ডে চুলকানি একটি বড় স্থান দখল করে আছে।

ভূমিকা আর দীর্ঘায়িত না করে সর্ববিধ চুলকানির বিষয়ে পারদর্শী জনৈক চুলকানি বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হওয়া যাক। প্রথমেই জানতে চাইলাম—দেশে, এত কিছু থাকতে হঠাৎ এই অরুচিকর নিম্নমানের শব্দ সংবলিত একটি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হলেন—কারণ কি?

চুলকানি বিশেষজ্ঞ : এই মিঞা আপনি আতেঁল নাকি?

বল্লাম —না। এখনো হতে পারি নি।

চু: বি: এই শব্দটাকে যারা খারাপ বলে ওদের হাতের পজিসন দেখেছেন? দেখবেন কথা বলার সময় হয় হাতটা কানের ভিতরে থাকবে নইলে নাকের ভিতরে

থাকবে। আর যারা একটু বেশি সেয়ানা আঁতেল, ওরা চোরা চুলকানি দেয়।

প্র : আমার মনে হয় আমরা আসল প্রশ্ন থেকে সরে যাচ্ছি।

চু: বি: বলছি। শুনেন, বিশেষজ্ঞ হয়েছি কতগুলো কারণে। প্রথম কারণ—আমি কিন্তু খালি আঙুলের চুলকানির বিশেষজ্ঞ না। কথার চুলকানিরও বিশেষজ্ঞ।

প্র : ঠিক বুঝলাম না।

চু. বি. : বুঝাচ্ছি। এই যে রাস্তাঘাটে চলেন একটা জিনিস খেয়াল করেছেন? দেখবেন পুরো ঢাকা শহরে কতো মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে কোনো কাজ নাই। কিন্তু চুলকানি আছে। অর্থাৎ যার কাজ নাই—তারও চুলকানির অভ্যাস আছে, সিনেমার পোস্টার দেখছে—ওদিকে পশ্চাৎদেশে হস্ত ব্যস্ত চুলকানিতে। রিকশার ওপর পা তুলে চালক বসে আছে। চুলকানিতে ব্যস্ত। কেরানি সাহেব অফিসে ফুল স্পীডে ফ্যান ছেড়ে দিয়ে বাতাস খাচ্ছেন। আর হস্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা শরীরময়। এরমধ্যে আবার ইন্টেলেকচুয়াল চুলকানিও আছে। আঁতেলের মতো চুলকায়। অর্থাৎ খুব সতর্কে চুলকায় যাতে অন্যে না দেখে। পাছে তার মান কমে যায়। সবই হচ্ছে ব্যবহারিক চুলকানি। মাঝে মাঝে মনে হয় পুরো দেশে একটা চুলকানি প্রতিযোগিতা চলছে। এরপর আসেন দ্বিতীয় পর্যায়ের চুলকানিতে।

প্র : সেটা কী রকম?

উত্তর : আমরা সবাই পরের ভিটায় ঘুঘু চড়াতে উৎসুক। চোখের সামনে অন্যের উন্নতি হবে এটা সহ্য করা যায়? বুক ফেটে যেতে চায়। চোখের সামনে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকলে একদিন না একদিন হার্ট এ্যাটাক হতে বাধ্য। সবার মধ্যে মোটামুটি হিংসা এবং পরশ্রীকাতরতা রয়েছে।

প্র : প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি মনে হয়।

উত্তর : রাখেন সাহেব, ভূমিকা বলতে দিন—কেউ যদি বলে অমুকের ছেলের চাকরি হয়েছে অমনি অন্যে বলে ওঠে চাকরি হয়েছে তো কী হয়েছে? বেতন পাবে না। কেউ মরে গেলে আমরা ফিরে তাকাই না। কারণ ও মরলে আমার কী? পৃথিবীরই বা কী? ধাক্কা খাবে তো তার পরিবার পরিজন। আমরা নিজেরাই তো কতজন কতজনের মৃত্যু কামনা করি। এসবই চুলকানির ফসল। একের উন্নতি দেখলে অন্যের চুলকানি বেড়ে যায়। এক নেতা এক কথা বলে, অন্য নেতার চুলকানির জন্ম দেয়। তারপর শুরু হয় পারস্পরিক পিঠ চুলকানি। এসব ক্ষেত্রে হস্ত-নয়-মুখ ব্যবহার করা হয়। যা দেশের ক্ষতি ডেকে আনে। পরিবেশ নষ্ট হয়। পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়। তখন আর নিজেরা শত মেডিসিন দিয়েও এই চুলকানি থামাতে পারে না। প্রয়োজন হয় বিশেষজ্ঞের। আমরা নিজেরা নিজেরা চুলকাতে চুলকাতে এখন কোন পর্যায়ে এসেছি বুঝতে পারেন না? আসলে আমাদের পুরো

দেশ এখন এলার্জিতে ভরা।

প্র : মুক্তির উপায় বললেন না—

উত্তর : জন্মিলে মরিতে হইবে—এটাইতো জীবন দর্শন। দিন ফুরোবে, মানুষ চলে যাবে। সময় কম। কাজ করে যাও। এমন কাজ কর না—যাতে অন্যে হাসে। বহুৎ তো চুলকানো হল। আর নয়। চুলকানিতে মলম লাগান, নইলে ঘা হয়ে যাবে। আর একবার যদি ঘা হয়েই যায় তখন আর সারাবার লোকও পাবেন না।

পলিটিক্যাল মাস

মহান বিজয়ের মাস হচ্ছে ডিসেম্বর মাস। এই মাসের প্রথমদিকে দিকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যৌথ বাহিনীর অভিযান ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাক বাহিনী পরাজিত হয়ে আস্তে আস্তে ঢাকার দিকে পলায়ন করতে থাকে। বিভিন্ন মুক্তাঞ্চলে স্বাধীনতার পতাকা হাতে জনতার ঢল নামে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হয়তো ভেবেছিল তাদের কামানের গর্জনের কাছে পিছু হটে যাবে বাঙালি জাতি। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দেখিয়ে শাসন করা যাবে এই জাতিকে। কিন্তু সাহসী জাতি তাদের সাহস ও বিশ্বাসের সঙ্গে যুদ্ধ করে ছিনিয়ে এনেছে বিজয়। ঐতিহ্য ও সাহসের গুণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমর কৌশলে দক্ষ হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাংলার সাধারণ মানুষ। ইয়াহিয়ার লেলিয়ে দেয়া রক্ত পিপাসু সামরিক বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছে। আর এই সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়েছে এদেশের লাখ লাখ মুক্তিপাগল মানুষ। জীবন দিয়েছেন এদেশের শিল্পী, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী। যাদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে বাংলার ধূসর মাটি আর সবুজ ঘাস। যাদের আত্মত্যাগের মহিমায় আজ এই বিজয়।

মানুষ যত আঘাত পায়, ততই প্রতিঘাতের ক্ষমতা অর্জন করে। এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আর সেই প্রতিঘাতের মাধ্যমেই শত আঘাতে জর্জরিত বাংলার মুক্তিকামী মানুষ ছিনিয়ে এনেছে মুক্তি। কাংক্ষিত বিজয়। স্বাধীনতার ২৩ টি বছর গত হতে চলল। আজকের এই মহান বিজয়ের মাসে আমাদের অনুভূতি কী? এই প্রশ্নের উত্তর কী হবে? ৩০ লাখ শহীদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের কাংক্ষিত স্বাধীনতা। সেই সময় বীর মুক্তিযোদ্ধারা স্বদেশের মাটি চুম্বন করে বলেছিল, আমি প্রস্তুত। চালাও গুলি, আমার প্রতিটি রক্ত বিন্দু আমার প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করবে। (সূত্র–বাংলাদেশের সাংবধিানিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়) এমনি লাখ লাখ বীর শহীদের রক্তে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশ। অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। যে বীর শহীদরা দেশের জন্য আত্মাহুতি দিয়েছেন তারা

কি বাংলাদেশের আজকের এই অবস্থা দেখে খুশি হতেন? বিজয়ের এই ২৩ তম বছরে দেশের সাধারণ মানুষ কী ভাবছে? পাকিস্তানের নিপীড়ক শাকদেরই শুধু নয়, বাংলাদেশের মানুষ তাদের সংগ্রাম, সাহস, আত্মত্যাগ ও দক্ষতার মাধ্যমে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ সকল প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবিলা করেছে। অথচ আমরা যেন নিজেরা মেতে রয়েছি অন্তর্দ্বন্দ্বে-অন্তর্কলহে। সামান্য বিষয়েরও সুরাহা করতে পরি না। বিজয়ের মাসে যেখানে আমাদের আনন্দে উৎসবে মুখর থাকার কথা—অথচ সেখানে আমাদের সময় কাটে উৎকণ্ঠায় ও উদ্বেগে, উত্তেজনায় সবারই দুশ্চিন্তা—কখন কী অঘটন ঘটে। বাংলাদেশের সরকার প্রধান জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনগণেরই প্রতিনিধি। তাই বাংলাদেশকে বলা হয় প্রজাতন্ত্র। বাংলাদেশের সংবিধানের (৭) (১) (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সে ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এ সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হবে (সূত্র-বাংলাদেশেরে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়) সেই জনগণ অনেকটা অসহায়। বিরোধীপক্ষ এই জনগণের জন্যই দুর্বার আন্দোলনের ডাক দেন। বলেন—এই সরকারের পদত্যাগই এখন জনগণের দাবি। অর্থাৎ গদি তাকে ছাড়তে হবেই। সরকার পক্ষ অর্থাৎ সরকারি দল বলেন, জনগণ আমাদের মসনদে বসিয়েছে। আমি গদি ছাড়বো না।

এ-যেন স্কুল-কলেজের দড়ি টানাটানি। দুই দিকে দুই দল ধরবে, নির্দিষ্ট সময়ে রেফারি বাঁশি ফুঁ দেবেন। টানাটানি শুরু হবে। যে দলের জোর বেশি সে দল জিতবে। আমাদের এই রাজনৈতিক অবস্থাটাও অনেকটা এই দড়ি টানাটানির মত। আর দড়ি হচ্ছে—গদি। উভয়পক্ষের এই গদি আন্দোলনে জনগণের হয়েছে জ্বালা। কিন্তু এই দড়ি টানাটানির জন্য এই মহান মাস কেন? যে বিজয়ের মাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মত্যাগ। তারা তো তাদের জীবন দিয়ে আমাদের একটি সুন্দর দেশ দিয়ে গেছেন। দিয়েছেন স্বাধীনতা। নিজেদের ভূখণ্ডে আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে কাজ করব, গড়ে তুলব একটি সুখী—সমৃদ্ধশালী দেশ। পৃথিবীর বুকে জাতি হিসেবে আমরা একটি সম্মানজনক আসনে স্থান করে নেবো কিন্তু দেশের বিশিষ্ট ব্যাক্তি হয়ে জনগণকে পুঁজি করে তাদের ভাগ্যন্নোয়নের দোহাই দিয়ে আমরা যা করছি তাতে কি দেশ এগুবে? তাতে কি শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে? এতে কি জনগণের ভাগ্যন্নোয়ন হবে? নিজের অধিকার আদায় করা, ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রাম করা, কিংবা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য আন্দোলন করা সকলের গণতান্ত্রিক অধিকার, একথা অনস্বীকার্য।

কিন্তু অধিকাংশ সময়েই দেখা গেছে, এই সংগ্রাম বা আন্দোলনটা বিজয়ের মাস এই ডিসেম্বরেই সংঘটিত হয়। এযেন পলিটিক্যাল সিজনের পলিটিক্যাল মাসে

রূপান্তরিত হয়েছে। অন্তত শহীদদের কথা চিন্তা করেও কি আমরা সব ধরনের আন্দোলন, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, উত্তেজনাকে ভুলে গিয়ে সব ধরনের আন্দোলনকে দূরে রেখে, স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদদের স্মরণ করার জন্য, বিজয়ের আনন্দে অংশগ্রহণ করার জন্য, আমাদের মহান শহীদদের ত্যাগ তিতিক্ষার কথা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য অন্তত এই একটি মাসকে তার যোগ্য মর্যাদা দিতে পারি না? মহান বিজয়ের এই মাসটি যেন আর 'পলিটিক্যাল মাস" হিসেবে ব্যবহৃত না হয়।

সাহেবের বাচ্চা

নিজের দেশকে কে না ভালোবাসেন। তাই কবির কবিতায়ও ফুটে ওঠে দেশপ্রীতির কথা।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ,
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।

আমরা সবাই মুখে দেশপ্রেমের কথা বলি। অন্তরটা দেখা যায় না তাই বোঝা যায় না মুখের এ-কথার সঙ্গে অন্তরের মিল রয়েছে কিনা। আমরা সবাই বলি এদেশ আমার। এদেশকে যে নিজের বলে ভাববে এদেশ তার। অর্থাৎ এদেশের কল্যাণ দেখে যার মন আনন্দে ভরে উঠবে এদেশ তার। এদেশের দুঃখে কাঁদবে যে, এদেশ তার। আর এদেশ তাদের যারা এদেশের উন্নয়নের জন্য এদেশকে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করবে। আমরা এদেশের সংস্কৃতির কথা বলি। প্রচলিতভাবে শিক্ষা-শিল্পকলা ও সংস্কৃতি-কথাগুলো আলাদাভাবে উচ্চারিত হলেও বিষয়গুলো সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন নয়। দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন চিন্তাবিদগণ সংস্কৃতির বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। আধুনিক যুগে সমাজ বিজ্ঞানীরা বুদ্ধি ও আবেগজাত যাবতীয় বিষয়কে সংস্কৃতিচর্চার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সামাজিক আচার-আচরণ, ভাবাদর্শ, নৈতিকতা, জীবনযাত্রা প্রণালী, জাতিসত্ত্বা, আইন, রাজনীতি, নন্দনতত্ত্ব সমাজের এইসব ব্যাপক বিষয়াবলীকেই সংস্কৃতি বোঝায়। মুখে আমরা আমাদের সংস্কৃতির পূজারি বললেও আমাদের চলচ্চিত্র, নাটক, সঙ্গীত, সাহিত্য, রেডিও, টিভি, প্রচারে, বিজ্ঞাপনে সর্বোপরি আমাদের আচার, আচরণ, চলাফেরা-কথাবার্তায়, পোশাক-পরিচ্ছেদে এমনকি রুচিবোধেও আমাদের সংস্কৃতিকে প্রশ্নের সম্মুখীন করছে। মনে হয় আমরা যেন অবক্ষয়ী মূল্যবোধের লালন পালন করছি। যার

অভিব্যাপ্তি ঘটছে আমাদের সমাজ জীবনেও। আমাদের সমাজজীবনে আমরা কিভাবে অপরের দ্বারা প্রভাবিত এবং অন্যের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার জন্য আমাদের কি আকুতি ব্যাকুতি রয়েছে সে সম্পর্কিত দু' একটি ছোট্ট উদাহরণ দেয়া যাক।

জন্ম থেকেই শুরু করি। কারো বাচ্চা দেখতে খুব সুন্দর হলে আমরা আহলাদে আটখানা হয়ে যে কথাটি প্রথম বলি তা হচ্ছে—"ইমা—তোমার বাচ্চাটা দেখতে যা সুন্দর হয়েছে। ঠিক যেন সাহেবের বাচ্চা।" অর্থাৎ এদেশে যেন কোনো সুন্দর বাচ্চা জন্ম হয় না। আর পশ্চিমে সব বাচ্চাই যেন সুন্দর। কিন্তু ঐ সৌন্দর্য্য যদি গাত্রবর্ণ দিয়ে বিবেচনা করা হয় তাহলে ভিন্ন কথা। পশ্চিমা দেশীয় মানুষগুলো খুব ভদ্র। অন্তরের খবর জানা নেই তবে মুখে বেশ ভদ্রতা দেখেছি। অহেতুকও প্রশংসা করে থাকে। মাথায় চুলের পরিমাণ কম থাকলেও সুন্দর 'হেয়ার স্টাইল' বলে যেমন প্রশংসা করে তেমনি কোনো বঙ্গ ললনাকে শাড়ি পড়ে চলতে দেখলে বলে উঠে, " lovely, lovely"

কিন্তু এই সৌন্দর্য গ্রহণ করার জন্য বা Lovely হবার জন্য তারা কেউই শাড়ি পরিধান করে না। কিন্তু আমরা বোধহয় ওদের চাইতেও ভদ্র। মুখে তেমনভাবে না বললেও অন্তর দিয়ে কিন্তু ওদের সংস্কৃতিকে ভালোবাসি। আচার আচরণে, পোশাক পরিচ্ছদে। কোট, প্যান্ট, টাই ওদের সাধারণ পোশাক হলেও আমাদের এখানে ওটা বেশ 'খানদানী' পোশাক হিসেবে পড়া হয় আর মুখে ঠুস-ঠাস ইংরেজি বুলি আউড়ে উচ্চ শিক্ষিতের লেবাস ধারণ করা হয়।

বাজনার ব্যাপারেও তাই। সেতার, তবলা বাদন শুনলে ওরা উপভোগ করে, আনন্দিত হয়। কিন্তু কালচার হিসেবে গ্রহণ করে না। আর আমরা আস্তে আস্তে এসবের বাদন ভুলে ওদিকে যাত্রা শুরু করেছি এবং অনেকদূর পৌঁছে গেছি। আমাদের দেশের মিউজিক শুনলে বরং ওদেরই ভ্রম হতে পারে এই ভেবে যে-আমি কি স্বদেশে আছি না বিদেশে। ওরা 31st নাইটে নৃত্য করে। ডিসকো পার্টি করে। আমরাও করি। বরং একজন আর একজনকে আমন্ত্রণ জানাই—"এই কাল ১২ টা ১ মিনিটে কিন্তু এস। সেলিব্রেট করব।" আবার ১লা বৈশাখে এদেরই কেউ কেউ বটতলায় যায় পান্তাভাত খেতে। ঐদিন সবারই মনে পড়ে আমরা মাছে ভাতে বাঙালি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই খাওয়ার সঙ্গে অন্তরের মিলের বেশ ব্যবধান রয়েছে। সে কারণেই নাকি হঠাৎ পান্তাভাত পেটে পড়ায় অনেকেরই 'পৈটিক বিমার" দেখা দেয়। আবার ঐসব দেশে ঘন ঘন বিয়ে করা এবং ঘন ঘন ছেড়ে দেওয়া একটি সহজ ব্যাপার। আমাদের এখানে ইদানিং এ ব্যাপারটি সহজ হয়ে এসেছে।

পাশ্চাত্যের খারাপ বা মন্দ জিনিসগুলো আমরা যতো সহজে নিতে পারি, ভালো

জিনিসগুলো আবার ততো সহজে নিতে পারি না। যেমন ঐসব দেশে মানুষের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওদের কর্মনিষ্ঠা। ওরা পরিশ্রমী। তাই ওসব দেশে বিশ্ববরেণ্য শিল্পী, কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক রয়েছেন। ওদের কাজে ফাঁকি নেই। আর আমাদের ফাঁকিহীন কাজ নেই। ওরা সবাই চিন্তা করে কী করে দেশের ভালো করা যায়। আমরা চিন্তা করি কী করে নিজের ভালো করা যায়। আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে পাশ্চাত্যের রাজনীতিতে শৃঙ্খলা রয়েছে। বাচ্চাসহ ট্রলি নিয়ে মা মিছিলে অংশ নিতে পারে। আর আমরা বাচ্চা ও মা নিয়ে রাস্তায় যাওয়া তো দূরের কথা, রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হলে ঘরে দরজা আটকে দিয়েও টেনশনে থাকি। এই বুঝি কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়া কাঁদাতে আসছে। কিংবা কোনো বীর যোদ্ধার (!) কাটা রাইফেলের ছোড়া গুলি জানলার কাঁচ ভেঙে পিঠে এসে ঢুকছে, সেই টেনশন। এই অত্যধিক টেনশনের কারণে দেশে নাকি এখন প্রেসারের রোগীও বেড়ে গেছে। আবার আমাদের অনেকেরই দেশের প্রতি এত মায়া যে—দেশে দেশপ্রেমিকের ভাব ধরি, দশের জন্য জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দেবার কথা বলি, আবার তারাই নিজের সন্তানকে বিদেশে পাঠান—যুক্তি হচ্ছে—এখানে শিক্ষার পরিবেশ নেই। সুতরাং আমরা মুখে যতোই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা বলি, দেশপ্রেমিক হিসাবে নিজেকে দাবি করি—কিন্তু অন্তরে? সুতরাং আমাদের এখানে যারা শিক্ষা, শিল্পকলা, সংস্কৃতি চর্চা বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত তাদেরই আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে সত্যিকার দেশপ্রেমিক হিসেবে। কবিগুরু বলেছেন—দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মাটিতে তৈরি নয় দেশ মানুষের তৈরি। মানুষ যদি প্রকাশময় হয় তবেই দেশ হয় প্রকাশিত'। সুতরাং আমাদের এই প্রিয় স্বদেশভূমিকে পৃথিবীর বুকে একটি সুন্দর, সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে তুলে ধরার জন্য কিছু মানুষ প্রয়োজন। যে মানুষের অভাব আমাদের নেই, প্রয়োজন শুধু আন্তরিকতার।